বাতায়ন
কাগজের নৌকা
ধারাবাহিক

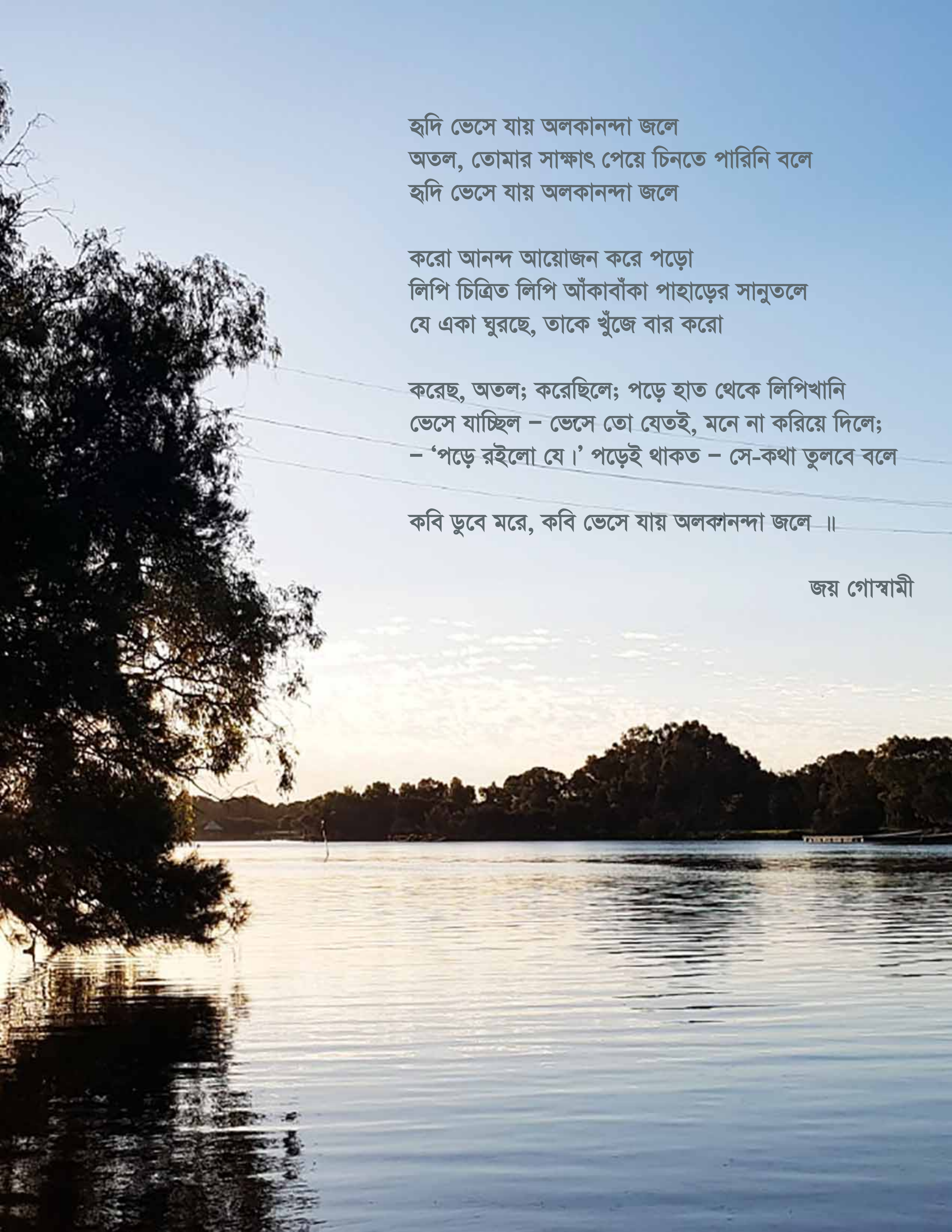

হৃদি ভেসে যায় অলকানন্দা জলে
অতল, তোমার সাক্ষাৎ পেয়ে চিনতে পারিনি বলে
হৃদি ভেসে যায় অলকানন্দা জলে

করো আনন্দ আয়োজন করে পড়ো
লিপি চিত্রিত লিপি আঁকাবাঁকা পাহাড়ের সানুতলে
যে একা ঘুরছে, তাকে খুঁজে বার করো

করেছ, অতল; করেছিলে; পড়ে হাত থেকে লিপিখানি
ভেসে যাচ্ছিল – ভেসে তো যেতই, মনে না করিয়ে দিলে;
– 'পড়ে রইলো যে।' পড়েই থাকত – সে-কথা তুলবে বলে

কবি ডুবে মরে, কবি ভেসে যায় অলকানন্দা জলে ॥

জয় গোস্বামী

কাগজের নৌকা

তৃতীয় সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০১৮

সম্পাদনা

মানস ঘোষ

Issue Number 3 : December, 2018

Editor
Manas Ghosh, Kolkata, India

Editorial Team
Ranjita Chattopadhyay, IL, USA
Jill Charles, IL, USA (English Section)

Coordinator
Manas Ghosh, Kolkata, India

Networking & Communication
Biswajit Matilal, Kolkata, India

Design and Art Layout
Kajal & Subrata, Kolkata, India

Website Design and Support
Susanta Nandi, India

Published By
BATAYAN INCORPORATED
Western Australia
Registered No. : A1022301D
E-mail: info@batayan.org
www.batayan.org

Concept & Production
Anusri Banerjee

Photo & Artwork Credit

Benjamin Ghosh — **Front Cover & Illustrations**

বেঞ্জামিন ঘোষ (মাঙ্গল্য) এখনো স্কুলছাত্র। তবে তার যাবতীয় আগ্রহ আবর্তিত হচ্ছে, ছবি আঁকাকে ঘিরে । পেন্সিল স্কেচ, রং-তুলি ছাড়াও সে ভালবাসে বিভিন্ন অপ্রচলিত উপাদানকে শিল্পের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতে। অন্যান্য কাজের সঙ্গে নিয়মিত কমিক্স এঁকে চলেছে ছোটদের একটি শিক্ষামূলক পত্রিকার জন্য । বাতায়নের ধারাবাহিক পত্রিকায় বেঞ্জামিনের এই প্রথম কাজ । অতএব আমাদের সঙ্গে সেও তাকিয়ে আছে পাঠকের প্রতিক্রিয়ার দিকে ।

Balarka Banerjee — **Front Inside Cover**

Balarka Banerjee — Balarka is a Molecular Biologist by profession and an executive in a Biotech company. Besides science his other passions are Drama — writing, acting, directing — Poetry and Art. He likes good cinema and music. He is a foodie and a good cook. No wonder he enjoys writing about his experiences and interests.

Durba Bandyopadhyay — **Inside Back Cover**

Durba Bandyopadhyay — Durba is a doctorate in Microbiology, currently a consultant with IMRB — Kantar for an UNICEF governed project on Health & Nutrition. Durba loves art, poetry and music.

বাতায়ন পত্রিকা **BATAYAN INCORPORATED, Western Australia** দ্বারা প্রকাশিত ও সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত । প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া, এই পত্রিকায় প্রকাশিত যে কোন অংশের পুনর্মুদ্রণ বা যে কোন ভাবে ব্যবহার নিষিদ্ধ। রচনায় প্রকাশিত মতামত সম্পূর্ণ ভাবে রচয়িতায় সীমাবদ্ধ।

Batayan magazine is published by **BATAYAN INCORPORATED, Western Australia**. No part of the articles in this issue can be re-printed without the prior approval of the publisher. The editors are not responsible for the contents of the articles in this issue. The opinions expressed in these articles are solely those of the contributors and are not representative of the Batayan Committee.

সম্পাদকীয়

“হে পিতা, এদের ক্ষমা করো, এরা জানেনা এরা কি করছে।” আজ থেকে প্রায় দুহাজার বছর আগে স্বয়ং ঈশ্বরের পুত্র বলে গিয়েছিলেন এ কথা। এই দুহাজার বছরে তাঁকে আমরা ভুলিনি, তাঁর উপাসনা আরাধনার অনেক অনেক প্রকরণ আমরা মেনে চলি, কিন্তু নিজের জীবন দিয়েও যে শিক্ষা তিনি আমাদের দিতে চেয়েছিলেন, তা আজ বিস্মৃতপ্রায়।

‘তোমার পূজার ছলে তোমায় ভুলেই থাকি।’

ডিসেম্বর পঁচিশ তারিখ, তাঁরই জন্মদিনের উৎসবে সামিল হয় সারা বিশ্বে, অথচ এবছর অক্সফোর্ড অভিধানের সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত শব্দের শিরোপা পেল, “টক্সিক”! বিষাক্ত! শুধু যীশু নন, পৃথিবীজুড়ে এই বিদ্বেষ আর বিভাজনের দূষিত আবহে, মহাবীর, বুদ্ধ থেকে নিকট অতীতের স্বামী বিবেকানন্দের স্মরণে ও পালনে বুঝি একইরকম বৈপরীত্য। তাই তো রবিঠাকুর লিখেছিলেন,

তারা বলে গেল, ‘ক্ষমা করো সবে’
বলে গেল ‘ভালোবাসো’,
অন্তর হতে বিদ্বেষবিষ নাশো।
বরণীয় তারা স্মরণীয় তারা, তবুও বাহিরদ্বারে,
আজি দুর্দিনে ফিরানু তাদের ব্যর্থ নমস্কারে।

শুনেছি, যারা গান শুনতে ভালোবাসেন তারা জঘন্য অপরাধ করতে পারেন না। মনোবিদরাও বলে থাকেন, গানের চর্চা হোক বা জ্ঞানের চর্চা, সাহিত্য হোক বা শিল্পচর্চা, মানুষের মনকে তুলনামূলকভাবে সুস্থ ও সুন্দর রাখতে সাহায্য করে। তাই আসুন, এই বড়দিনে আমরা গান, শিল্প, সাহিত্যের বিশ্বব্যাপী আয়োজনে আরো বেশী মানুষকে সাথে নিয়ে চলার চেষ্টা করি। বিশুদ্ধ জ্ঞানের চর্চায় উদ্বুদ্ধ করি নতুন প্রজন্মকে। দুহাজার উনিশের সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত শব্দ হোক, “সৌভাতৃত্ব”।

উৎসবের দিনগুলো সবার খুব ভালো কাটুক। বাতায়ন পরিবারের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই আগাম শুভেচ্ছা।

মানস ঘোষ।
সম্পাদক, কাগজের নৌকা

বাতায়ন বুলেটিন !

লিখেছেন স্নেহাশিস ভট্টাচার্য –

ভাল থাকা নয়, জীবনে বুঁদ হয়ে থাকার রহস্য ওই নেশার প্রতিটা বিন্দুতে বিন্দুতে, সুখের উৎসে সেই নেশা, নেশা মুক্তির জন্য চাই অন্য নেশা, সেই গিরিশবাবুর কথা, ঠাকুর তাঁকে যে নেশার পথ দেখিয়েছিলেন সেই নেশা মদিরা ছুঁয়ে দেখতে দেয় না। সেই পথ মাড়িয়ে কিভাবে ভালবাসার বসন্ত খোঁজা যায়, শুনছিলাম বুঁদ হয়ে শাশ্বতীদির কথায়, গল্পে। মানবাধিকার কমিশনের আইনে শুধু নয়, জীবনের প্রকোষ্ঠে ঢুকে নিজেকে নিংড়ে কিভাবে কলম সঙ্গী হয়ে ওঠে তার দৃষ্টান্ত শাশ্বতী নন্দী। সামনে বসে শুনতে থাকার মজা থাকে। প্রবাসী দিদি অনুশ্রীদি ঝাঁপি খুলে বসলে শেষ হবার নয়। অস্ট্রেলিয়ায় থেকে কিভাবে বাংলা ভাষা তথা এই দেশকে ভালবেসে অক্লান্ত হওয়া যায় তার একটা গা শিরশিরে অনুভূতি মাখতে মাখতে একটা কথা গায়ে আটকে রইলো। সবাইকে তো সব কিছু দেওয়া হলো, নিজের জন্য পাওনা, একদম নিজস্ব তো বয়সটাই। না খুঁজে পাওয়া চুলের ভিতর হাত চালাবার ব্যর্থ প্রয়াস করে দেখলাম ধারালো হতে অনেক শান দিতে হবে।

গল্প গতি নিয়েছে, বাঁক ঘুরতেই যেমন সামনে এসে দাঁড়ায় নীল আকাশ তার গায়ে শুভ্র পাহাড়কে এঁকে নিয়ে তেমনি নিখুঁতভাবে ভৌগলিক অবস্থান খুঁজে নিয়ে উপাসনা হাজির। সন্ধ্যাটা একটু হেসে উঠলো। অনেক কচি কাঁচাদের মানুষ করা পেশা, সকলের প্রিয় দিদি, গান কবিতা গল্প আবার রান্নায় নিপুনা, জীবনের চলার পথে আদ্যোপান্ত সৎ মানুষটি যখন আবৃত্তি করেন কানে বেজে থাকে। যে মানুষটার অকৃত্রিম ভালোবাসা আর পথ দেখানকে ভরসা করে বাতায়নের জানলায় মুখ বাড়িয়েছি সেই মানসদা, সাথে অনুশ্রীদি, শাশ্বতীদি, উপাসনা সকলের সমস্ত আদান প্রদানে আর দাদা, কাজলদা, পার্থদা, সুব্রত সবার সঙ্গতে বাতায়নের এসরাজ আজ শীত ছোঁয়া সন্ধ্যায় এক সুরের মূর্ছনা নিয়ে হাজির হলো। বাতায়নের জানলায় শীত তার উষ্ণতাকে নিয়ে হাজির, বহু কলমের আঁচড় নিয়ে বাতায়ন প্রস্তুত নতুনকে আপন করে নিতে। বাতায়ন পাঠকদের জন্য সুসংবাদ, পরের সংখ্যাগুলিতে শাশ্বতী নন্দী ও উপাসনা সরকারের বেশ কিছু দুর্দান্ত রচনায় সমৃদ্ধ হতে চলেছে আমাদের পত্রিকা।

সবাইকে জানাই বড়দিনের শুভেচ্ছা।

বাতায়ন বুলেটিন !

কোলকাতায় বাতায়ন

বাতায়ন

ভুবনজোড়া স্বজন সুজন
বাতায়নের ধার ঘেঁষে,
চা'য়ের কাপে তুফান উঠুক
৫এ পা'য়ের মজলিসে ।

~~~~~~~~~~~~

আগামী ৬ই জানুয়ারী, ২০১৯ (রবিবার)

"বাতায়ন" পত্রিকার পঞ্চম বর্ষ পদার্পণ উপলক্ষে ভারতীয় ও প্রবাসী লেখক, পাঠক ও প্রিয়জনদের নিয়ে এক জমজমাট আড্ডার আসর ।

স্থান : "ভবন'স আশুতোষ কলেজ অফ্ কমিউনিকেশন এ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট",
৭৭ নং আশুতোষ মুখার্জী রোড, কলকাতা - ৭০০ ০২৫ ।

"৫এ পা"

এই আনন্দযজ্ঞে আপনাদের সাদর আমন্ত্রণ । আপনার উপস্থিতিই হবে আমাদের এগিয়ে চলার প্রেরণা ।

অনুশ্রী ব্যানার্জী
বাতায়ন

যোগাযোগ :

অনুশ্রী - ৮৪২০৩ ৩৯৬৮৬ | +৯১ ২৩৯৬ ৬৭১৭
মানস - ৯০০২০ ৮৫৫৬৮
স্নেহাশিষ - ৮৭৭৭৫ ০৩০৬৭

সৌজন্যে –

পত্রভারতী

Bharatiya Vidya Bhavan

অতিথি সমাবেশ শুরু বিকাল ৫' টা ।
~~~~~~~~~~~~

সূচীপত্র

ধারাবাহিক উপন্যাস

নবকুমার বসু	হটাবাহার	7

স্মৃতিকথা

সিদ্ধার্থ দে	সুনীল সাগরে	19

বড় গল্প

স্নেহাশিস ভট্টাচার্য	অচেনা ঢেউয়ের শব্দ	24

কাহিনি

দেবীপ্রিয়া রায়	একদিন যারা	29

রম্যরচনা

স্বর্ভানু সান্যাল	আঁতেল	38

কবিতা

পল্লববরন পাল	সনেটগুচ্ছ	40

ভ্রমণ

মৌসুমী রায়	লাদাখ ভ্রমণ	41

নাটক

বিশ্বদীপ চক্রবর্তী	তিন শালিখ	46

নবকুমার বসু

পর্ব ৩

হটাবাহার

সুদীপা বললেন, আচ্ছা শোন রবিন, কথাটা তোকে আগেও বলার চেষ্টা করেছি . . ।

কোন কথাটা মা ?

তোর কাজের ব্যাপারে ।

আমার কাজের ব্যাপারে কী কথা !

তোর এই ট্রেনিং পিরিয়ডটা শেষ হয়ে গেলে . . . . এদিকে, মানে সান্ডারল্যান্ড, নিউক্যাসেল-এর দিকে চলে আসতে পারিস না ! . . . . মানে তুই যদি এদিকে কোথাও প্র্যাকটিস করিস . . . . কত সলিসিটর তো এদিকেও . . . . ।

এভরিথিং ইজ পসিব্‌ল মা । কিন্তু ওই ডিসকাসানটা টেলিফোনে হয় না ।

সুদীপা অবুঝ নন । ব্যাপারটা ধরে নিয়ে বললেন — হ্যাঁ সেটা ঠিকই . . . . । একইসঙ্গে এবার জানতে চাইলেন, আচ্ছা শোন . . . . তুই এসময়ে হঠাৎ ফোন করলি কেন, সেটাই তো জিগ্যেস করা হল না ।

এমনিই মা . . . . জাস্ট ইচ্ছে করল । বলো . . . . কী করছো এখন ?

এই তো . . . . চা খাচ্ছিলাম . . . . তখন তোর টেলিফোন এলো । . . . . কিন্তু শুধু এটা জানার জন্য ফোন করলি ?

হোয়াই . . . . করতে পারি না ?

তা তো পারিসই । কিন্তু করিসনা বলেই তো জিগ্যেস করা ।

হ্যাঁ মা । আগে বাবার সঙ্গে কথা হতো মাঝে মাঝে . . . . সেটা তো হয় না । এখন মাঝেমাঝেই ভাবি, তুমি একা কিভাবে ম্যানেজ করছো . . . . ।

সুদীপা বললেন, আমি নিজেও বোধহয় ঠিক জানি না রে . . . . এতোগুলো দিন কিভাবে কাটিয়ে ফেললাম । শুধু টের পাই, এখনও একটা ঘোরের মধ্যে রয়েছি . . . . ।

রাতে ঘুমোতে পারো ?

প্রথম কয়েকদিন তো আধখানা করে স্লিপিং পিল খেয়েছিলাম . . . . একজন মহিলা কাউনসেলারও আসতেন । একটু একটু করে আমি নিজেই সেগুলো বন্ধ করেছি ।

য়্যু আর আ স্ট্রং ওম্যান মা ।

জানি না । কিন্তু একা আমায় চলতে হবে সেটা জানি ।

আমারাও তো আছি . . . ডোন্ট ফরগেট ।

সে কথা কি আর মনে করাতে হবে রে ! তবে আমার জন্য তোমরা কোনো স্যাক্রিফাইস করো, সেটা আমি চাই না । . . .

স্যাক্রিফাইস অনেক বড় জিনিস মা . . . . বললেই করা যায় না।

তা জানি না . . . . . তবে তোকে এবং মুনিয়াকে, দুজনকেই ভাবতে হবে – মা ঠিকই আছে . . . . তোমরা নিজেদের কাজ করো।

বাই দ্য ওয়ে মা . . . . তুমি টাকাপয়সা হাতে ঠিক ঠিক সব পেয়ে যাচ্ছো তো ?

এখনও পর্যন্ত কোনো অসুবিধে হয় নি। এখনও পর্যন্ত তোর বাবার স্যালারি যেমন আসতো তেমনই চলে আসছে। এরমধ্যে হাসপাতাল থেকে যোগাযোগ করেছে . . . . ওঁরা খুবই সিমপ্যাথেটিক। যা করার সব করছে। ইনল্যান্ড রেভিন্যু-ও চিঠি দিয়েছে . . . . সব ঠিকঠাক আছে বলেই মনে হচ্ছে।

তুমি কিন্তু কেয়ারফুল থাকবে মা। তোমার হাতে এখন অনেক টাকা আসবে . . . . এ্যান্ড এ্যাকোর্ডিংলি . . . . ।

সুদীপা ছেলেকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, দাঁড়া আসুক আগে। আমার কোনও তাড়াহুড়ো নেই।

তুমি কি কলকাতায় যাচ্ছো ?

যাবো বলেই তো ভেবেছি।

আমিও তোমার সঙ্গে যেতে পারলে ভালো হতো।

সে তো খুবই ভাল হতো . . . . কিন্তু হবে কি ? ছুটি পাবি ?

দেখি মা . . . . কী করা যায়। চেষ্টা করবো সামনের পরের উইকএন্ডে একবার বাড়ি আসার।

যখনই সুযোগ পাবি – আসিস। তবে কাজের ক্ষতি করে আসতে হবে না। আমি ঠিক আছি। এখানে লোকজন, বন্ধু-বান্ধব সবাই তো আছেন . . . . আমাদের বেঙ্গলি এসোসিয়েশনের সবাই-ও খোঁজখবর নেন। চিন্তা করিস না।

টেলিফোন ছেড়ে চায়ের কাপ টেনে নিলেন সুদীপা। নাহ্ ওটা আর খাওয়া যাবে না। ঠান্ডা জল হয়ে গেছে।

কিচেনের টেলিফোন থেকেই কথা বলছিলেন। এক মগ্ কফি বানিয়ে এবার ছোট বসার ঘরে এলেন। একতলার এই ঘরটা রজতাভ ব্যবহার করতেন নিজের অফিস হিসেবে। চেয়ার টেবিল – বইয়ের ব্যাগ ছাড়া একটা সোফাও আছে ঘরে। পেছন দিকের উঁচু ডেস্ক-এ একটা মিউজিক সেন্টার। নিজের ডাক্তারি পড়াশোনা, জার্নাল দেখা ছাড়াও নানান বই পড়ার অভ্যাস ছিল রজতাভর। পড়াশোনার সময়েও লো-ভল্যুমে গান চালিয়ে রাখতেন সিডি প্লেয়ারে। নিজের কাজ এবং বাড়ি সংক্রান্ত নানান কাগজপত্র, নথি, ব্যাংক-স্টেটমেন্ট – গ্যাস-ইলেক্ট্রিকের বিল, ইন্সিওরেন্স এর কাগজ . . . . নানান কিছু আলাদা আলাদা ফাইলবন্দী করে, ওপরে বড় বড় করে লিখে, নির্দিষ্ট ড্রয়ারে রেখে দিতেন।

টেবিলের ওপর চোখের সামনেই ছিল কম্পিউটার। খুব একটা এক্সপার্ট ছিলেন না কম্পিউটর ব্যবহারে। কিন্তু কাজ চালাতে পারতেন। ই-মেল দেখা এবং তার উত্তর দেওয়া, মাঝে মাঝে খবরের কাগজ পড়া . . . . এসব পারতেন। কিন্তু ব্যাংকের হিসেবনিকেশ, সেভিংস, বাড়ির মর্টগেজ . . . . এতো কিছু পেরে উঠতেন না। হাসপাতালের কাজ এবং সপ্তাহে একদিন নাইট অন কল এবং ছ সপ্তাহে একটা উইক এন্ড অন কল-এর পরে, কম্পিউটর নিয়ে আর বিশেষ মাথা ঘামাতেন না।

সুদীপাকে বলতেন, আমি যখন হাসপাতালে থাকি, তুমি তো তখন একটু একটু করে কম্পিউটরটা শিখতে পারো। সুদীপা হাতের কাজ সারতে সারতে উত্তর দিতেন, তুমি কি ভাবো . . . . তুমি হাসপাতালে বেরিয়ে গেলেই আমি পায়ের ওপর পা তুলে বসে থাকি ! নাকি নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুমোই !

আরে সে কথা হচ্ছে না।

তাহলে বলছো যে তুমি হাসপাতালে বেরিয়ে যাওয়ার পরে . . . একটা বাড়ির কত কাজ থাকে তোমার কোনো ধারণা আছে ! রজতাভ আশ্বাসের সুরে বলেন, আরে সে কি আমি বুঝি না ! কিন্তু একটা সময় তো তারপরেও তুমি বাইরে কাজ করতে। সুদীপা বলেন, করতাম . . . . কিন্তু ঘরসংসারের এতো দায়িত্ব তখন ছিল না। নতুন বাড়ির কাজও যে কত . . . .।

আসলে বছর তিনেক আগে সিল্ক উইলোবি-তেই যখন তাঁরা এই অপেক্ষাকৃত বড় বাড়িটা কিনে শিফট্ করেছিলেন, তারপর থেকে সুদীপার যে কাজ বেড়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আবার একদিক থেকে কিছু কিছু কাজ কমেছে, সেটাও সত্যি। কেননা রবিনের পরে রঞ্জনাও য়্যুনিভার্সিটি চলে গেছে এই বাড়িতে আসার ঠিক আগেই। কিন্তু বাড়ি বড় হয়ে গেলেই তার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বেশি সময় দিতে হয় । তাছাড়া সংসারের খুঁটিনাটি তো আছেই । রজতাভ বলতেন, জানি। কিন্তু তারমধ্যেও কম্পিউটর হ্যান্ডেল করতে শেখাটা এখন জরুরী।

সে আমিও জানি। সুদীপা বলতেন। কিন্তু তারজন্য তো ট্রেনিং নিতে যেতে হবে।

কোথাও যেতে হবে না। বেসিক যা কিছু আমিই তোমায় শিখিয়ে দেব। দেখবে প্র্যাকটিস করতে করতে . . . .। তারপর আটকে গেলে . . . . তখন তোমাকে আমি পাবো কোথায় !

মোবাইলে ফোন করবে . . . . । আরে সবাই এভাবেই শেখে । তারপর দেখো . . . . একবার শিখে গেলে . . . . কী ইন্টারেস্টিং মনে হবে পুরো জগৎটা তোমার সামনে এসে গেছে . . . . ই-মেল করবে, ফেসবুক-টুইটার করবে, চ্যাট করবে বন্ধুদের সঙ্গে । যাবতীয় শপিং, কেনা কাটা, হিসেব রাখা, সিনেমা দেখা – স্কাইপে, ছেলেমেয়েদের দেখতে দেখতে কথা বলা . . . . সব ওই স্ক্রিনের সামনে . . . .।

অতশত আমার দ্বারা হবে না। সুদীপা বলেন। তবে বেসিকটা শিখতে হবে মনে হচ্ছে . . . .।

রজতাভ হেসে বলতেন, আসলে তোমার শেখার ইচ্ছেটাই নেই . . . .। চলে যাচ্ছে . . . . ঠিকই আছে।

সুদীপা তারপরেও বলতেন, আমি শুনেছি, কম্পিউটার খুব এ্যাডিকটিভ জিনিস . . . . কাজকর্ম ছেড়ে অনেকে ওই . . . . ল্যাপটপ না কী বলে . . . . তাই নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকে। সংসার তাহলে শিকেয় উঠবে।

রজতাভ বলতেন, আচ্ছা বেশ ঠিক আছে . . . . আমি তোমাকে বেসিক ব্যাপারটা শেখাই তো আগে।

এখন সুদীপার মনে হয়, বছর দুয়েক ধরে কী ভাগ্যিস ওইটুকু প্র্যাকটিস অন্তত রেখেছিলেন ! কিছু না-হোক এখন রজতাভ চলে যাওয়ার পরে যেসব অফিসিয়াল চিঠিপত্র আসে তাঁর কাছে, সেগুলোর উত্তর তো দিতে পারেন । নেহাৎ প্রয়োজন হলে টেলিফোনে কারুর সঙ্গে পরামর্শ করে নেন। তারপর কম্পিউটরেই চিঠি লিখে 'সেন্ড' করে দেন। কত যে সময় বাঁচে, এখন প্রতিদিন টের পাচ্ছেন সুদীপা। একটু একটু করে আরও এটাসেটা শিখেও নিয়েছেন এখন।

রজতাভর সেই বসার আর কাজের ঘরটা এখন সুদীপার ও অফিসই হয়ে উঠেছে বলা যায়। সকাল-বিকেল কিছুক্ষণ করে না বসলে, নিজেরই মনে হয়, কোনো জরুরী কাজ পড়ে রইল কিনা . . . . কিংবা ইম্পর্টান্ট খবর হয়তো জানা হল না।

টেবিলের ডানদিকের কোস্টারে কফির মগ রেখে, বালিশ দিয়ে উঁচু করা ঘোরানো চেয়ারে বসলেন সুদীপা। ল্যাপটপটা ঠেলে সরিয়ে রাখলেন বাঁদিকে। বেশ কয়েকটা চিঠিপত্র এসেছে দু-তিন দিনে, এখনও দেখা হয় নি। শেড লাগানো নিচু টেবিল ল্যাম্প্টা জ্বালাতে গিয়েও . . . . কী ভেবে জ্বালালেন না । অথচ এই বিকেল সাড়ে চারটের মধ্যেই এখন আবছা আঁধার ঘরে বাইরে। সপ্তাহ দুয়েক আগে সময় একঘন্টা পিছিয়ে যেতেই হঠাৎ যেন দিনটা বেশি ছোট হয়ে গেল।

কাচের জানালা দিয়ে সুদীপার দৃষ্টি ঘরের বাইরে চলে গেছে।

হিসেব অনুযায়ী এখনও অটাম। সাহেবদের দেশে শরৎ-হেমন্তের ভিন্ন নাম নেই। দেশের হিসাবে অঘ্রাণমাসের গোড়ার

দিক এখন। হিমেল হাওয়া বইতে শুরু করেছে। সারাদিন ধরে পাতা ঝরছে গাছ থেকে। মাঝে মাঝেই বাতাসের তীব্রতায় ঝরা পাতা উড়ছে। এখনও ওক্ বার্চ-মেপল কিংবা চেরি গাছে কোথাও-কোথাও লাল-হলুদ পাতা রয়েছে। কিন্তু বোঝা যায় তাদের আর সে জেল্লা নেই। আর সপ্তাহ দুই-এর মধ্যেই সম্পূর্ণ ন্যাড়া, পত্রহীন হয়ে যাবে সমস্ত গাছ। স্যাঁতালো হাওয়ায় হিমকুয়াশা আর ঠান্ডায় শুকনো শাখা-প্রশাখা কাঁপতে থাকবে। এখনও বিকেলের মরা আলোয় দিন শেষের আকাশ দেখা যায়।

ওইটুকু দেখার আশাতেই যেন বিকেলের দিকে কিছুক্ষণ বাইরে তাকিয়ে থাকেন সুদীপা।

কিন্তু তাই বা আর কদিন ! সংক্ষিপ্ত, মেঘলা দিন কখন এসে কখন ফুরিয়ে যাবে টের পাওয়া যাবে না। আঁধারে ডোবা দেশটা থেকে সেই সময়েই কলকাতা চলে যাবেন বলে মনস্থির করেছেন সুদীপা। কাছেপিঠের বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গেও কথাবার্তা, আলোচনা হয়। সান্ডারল্যান্ড ছাড়া মিডলস্‌বরো, হার্টলেপুল-পিটার্লি-নিউক্যাসেল-এও একটু একটু করে যাতায়াত শুরু করেছেন সুদীপা। একা-একা গাড়ি চালিয়ে যাওয়ার অভ্যাস এতোদিন ছিল না। কিন্তু এখন অভ্যস্ত না হয়ে উপায় নেই। শুধু একাকীত্ব কাটাবার জন্যই যে বাড়ি থেকে বেরুনো, চেনাপরিচিতিদের সঙ্গে যোগাযোগ তা তো নয়। বাইরে অনেক কাজ আছে। বাড়ি সংক্রান্ত কাজই অনেক। মর্টগেজ পেমেন্ট, কাউন্সিল ট্যাকস, জেনারাল মেইনটেনেন্স . . . . এসবের কিছুই তো জানেন না সুদীপা। একটা ভাসা ভাসা ধারণা আছে মাত্র।

দু-জনের দুখানা গাড়িরও কাগজপত্র কম না। বছরে বছরে ইন্সিওরেন্স, রোডট্যাক্স, এমওটি-সার্ভিসিং . . . . এইসবেরও যাবতীয় পেপারস, ডকুমেন্টস, হিসেব রাখতেন রজতাভ। গোছানো স্বভাব ছিল বলে অবশ্য আলাদা-আলাদা ফাইল এবং ওপরে বড় বড় করে গাড়ির নম্বর লিখে রাখতেন। মোটামুটি সেগুলোও চোখ বুলিয়ে দেখে নিয়েছেন সুদীপা। একটা আন্দাজ পেয়ে গেছেন আগামী বছরের মার্চ-এপ্রিল পর্যন্ত সব ঠিকঠাক আছে . . . . এখনই ও নিয়ে ভাববার কিছু নেই।

তাহলেও মনে মনে ঠিক করে নিয়েছেন সুদীপা যে, দুটো গাড়ি রাখার কোনো মানে হয় না।

রজতাভর নতুন থ্রি-সিরিজের বি-এম-ডবলু-টা মোটে দেড় বছর আগে কিনেছিলেন . . . . এখনও দশহাজার মাইল হয় নি। এবার ওটাই তিনি ব্যবহার করবেন। বছর চারের পুরনো হন্ডা-সিভিকটাও এমন কিছু খারাপ গাড়ি না। ভেবে রেখেছেন, মুনিয়া যদি সামনের বছর পাশটাশ করে কোনো জব-এ জয়েন করে, তাহলে গাড়িটা মেয়ের নামে ট্রানসফার করে দেবেন। যদি অবশ্য ওর ইচ্ছে না থাকে, তাহলে রবিনের সঙ্গে কথা বলে ওটা বিক্রি করে দেবেন।

তবে সব থেকে আগে এখন দরকার, নিজের আর্থিক অবস্থা এবং অবস্থান সম্পর্কে সুদীপার একটি পরিষ্কার ধারণা। এতোকাল তো সত্যি নিজের নাক গলাবার কোনো প্রয়োজনই বোধ করেন নি। মোটামুটি একটা আন্দাজ ছিল রজতাভ কিরকম রোজগার করেন এবং সব খরচপত্র, বাড়ির মর্টগেজ, মুনিয়ার পড়াশুন . . . . ইত্যাদির পরেও প্রায় হাজার পাউন্ডের মতো প্রতিমাসে উদ্বৃত্ত হতো। কয়েকটা কিসব সঞ্চয় প্রকল্প করেছিলেন রজতাভ। মাসে মাসে সেইখানে উদ্বৃত্ত অর্থের বেশ খানিকটা চলে যেত। একটা অতিরিক্ত প্রাইভেট পেনশন স্কিম-এও কিছু কিছু রাখতেন। সুদীপা এটুকু জানেন যে এদেশে ব্যাংকে টাকা রেখে কোনো লাভ নেই, কেননা ইন্টারেস্ট একেবারে নগন্য। সেইজন্যেই নানানদিকে লোকে টাকা ইনভেস্ট করে। এর বেশি আর কিছু জ্ঞান তাঁর নেই। পিটার্লির শুভঙ্কর পাল সুদীপাকে জিগ্যেস করেছিলেন, রজতের সেভিংস কী কী আছে . . . . সব জানো ?

সুদীপা বলেছিলেন, মাঝে মাঝে বলতো . . . . কোথায় কিসব ফিক্সড্ করে রেখেছে . . . . ।

শোনো দীপা . . . . শুভঙ্কর বলেছেন, টাকাপয়সা, সেভিংস এসব ব্যাপারে ওরকম আন্দাজি কথাবার্তার কোনও মানে নেই। এখন লোকটা আর নেই, কিন্তু পরিশ্রমের রোজগার দিয়ে যা কিছু সঞ্চয় করেছে, সেগুলোর হিসেবনিকেশ তোমাকেই রাখতে হবে। সে তো বুঝতে পারছি পালদা . . . . কিন্তু এতোকাল কোনোদিন ওসব ব্যাপারে নাক গলাই নি . . . . এখন আমার অবস্থাটা বুঝতে পারছেন ! কোথায়, কোন ফাইলে, কী ডকুমেন্টস্ আছে না আছে . . . . ! প্রায় গলা বুজে এসেছিল

কথা বলতে বলতে। সুদীপার বিভ্রান্ত-অসহায় অবস্থা অনুমান করেছিলেন শুভঙ্কর পাল। ভরসা দেওয়ার মতো বলেছিলেন, অত নার্ভাস হওয়ার কিছু নেই দীপা। আমি একটা কথা তোমায় বলতে পারি, রজতের স্বভাব বরাবরই গোছানো, সুতরাং কোনো কাগজপত্রই ও এলোমেলো করে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখবে না। এ দেশটাও তোমাকে সাহায্য করবে। সুদীপা বললেন, তা তো জানি পালদা কিন্তু আমার সমস্যা হচ্ছে, কোত্থেকে শুরু করব তাই বুঝতে পারছি না।

পারবে, পারবে . . . . আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে যাবে। এটুকুর পরেই শুভঙ্কর বলেছিলেন, তুমি একটা কাজ করো দীপা। রজতের যে — যে ব্যাংকের সঙ্গে ট্রানজাকশন ছিল, সেই ফাইলগুলো বার করে চোখ বুলিয়ে যাও আগে . . . . দেখবে তুমি অধিকাংশ ইনফরেশনই সেখান থেকে পেয়ে যাবে। এদেশের সব ব্যাংকই ভীষণ মিটিকুলাস। প্রতি দু সপ্তাহ অন্তর ওদের স্টেটমেন্টগুলো দেখলেই সব জমাখরচের হিসেব পেয়ে যাবে।

সেগুলো কিছু কিছু আমি দেখতে শুরু করেছি পালদা।

তবে আর কী ! কোন কোন ব্যাংকের সঙ্গে ওর যোগাযোগ ছিল ?

মেইনলি দেখছি লয়েডস আর হ্যালিফ্যাকস . . . .।

বাড়ির মর্টগেজ-ও কি এদেরই কোনো একটা থেকে নেওয়া ?

হ্যাঁ পালদা। লয়েডস্ থেকেই নেওয়া, প্রতিমাসে একবার ক'রে . . . . ওখান থেকেই সাড়ে সাতশ পাউন্ড করে কাটা যায়। শুভঙ্কর পাল উৎসাহ দেওয়ার মতো বলেছিলেন, তবে . . . . এই তো বেশ সড়গড় হয়ে উঠেছো . . . .। এটুকুর সঙ্গেই যোগ করেছিলেন, তাড়াহুড়োর কিছু নেই দীপা। একটা ব্যাপার, এ দেশে সাহেবরা টাকাপয়সার ব্যাপারে কখনই ইচ্ছাকৃত কারচুপি করে না এবং মানুষকে হ্যারাস করে না . . . . বরং সাহায্য চাইলে যতটা সম্ভব করার চেষ্টা করে। তোমার ক্ষেত্রে আমি বলছি, তুমি নিজেও একটু একটু করে বুঝতে পারবে — ব্যাংক থেকে শুরু করে, ন্যাশানাল হেলথ সার্ভিস, হাসপাতালের এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিস এবং ইনল্যান্ড রেভিনিউ . . . . পেনশন অফিস . . . . তোমাকে কতখানি সাহায্য করে দেখবে।

সুদীপা বলেছিলেন, সে-ব্যাপারে আমার অবশ্য কোনো অভিযোগ নেই পালদা।

বললাম তো . . . . এসব পাবলিক সার্ভিসে রানীর দেশ এখনও একনম্বরে।

ইনফ্যাক্ট . . . . হসপিটাল থেকে ওঁরাই আমার সঙ্গে আগে যোগাযোগ করেছেন . . . .। বাড়িতে এসে দেখা করে যাওয়া ছাড়াও চিঠি লিখে জানিয়েছে . . . . যে কোনো ব্যাপারে দরকার হলেই যোগাযোগ করতে।

তাহলেই দ্যাখো . . . . ঘাবড়ানোর কিছু নেই। কিন্তু, শুভঙ্কর পাল সতর্ক করার মতো করে বলেছিলেন, অন্ধের মতো বিশ্বাস না করে, তোমায় নিজেকেও ব্যাপারগুলো জানতে হবে . . . . এবং দ্যাখো . . . . ইটস নট ডিফিকাল্ট . . . .।

আজ রজতাভর সেই টেবিলচেয়ারে বসেই, শুভঙ্কর পালের কথাগুলো মনে পড়ছিল সুদীপার।

মানুষটা চলে গেছে দুমাস হয়ে গেছে। আর এই দুমাসে অন্তত এটুকু বুঝেছেন সুদীপা . . . . নাহ্ অসহায় বোধ করার এখনও কিছু হয় নি, কেননা, টাকাপয়সার দিক থেকে তিনি যে জলে পড়বেন না, সেটা বিভিন্ন কাগজপত্র নাড়ানাড়ি করতে করতে বেশ বুঝে ফেলেছেন। এখনও আরও বেশ কিছু দেখা এবং বোঝার বাকি আছে, তা সত্বেও ধারণাটা পরিষ্কার হচ্ছে যে, যেসব আয়োজন রজতাভ করে গিয়েছেন, তারমধ্যে ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার দিকে বেশ ভালই গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

কিন্তু অর্থনৈতিক নিরাপত্তা কি মানুষকে জীবনের সবদিক থেকে সুরক্ষিত করে রাখতে পারে !

আজ কদিন ধরে এই প্রশ্নটা ঘুরে-ঘুরে সুদীপার মাথায় আসছে। বিশেষ করে এই সন্ধ্যার সময় আসন্ন অন্ধকার যখন একটু একটু করে চরাচরকে ঢেকে ফেলে, সুদীপার মনে হয় — মানুষের অসহায়তা, অনভিজ্ঞতার যেন শেষ নেই। একটা

মধ্যবিত্ত, মোটামুটি সচ্ছল, আটপৌরে সাংসারিক জীবনযাপন করে এসেছেন এতোদিন। বিদেশে থাকলেও এখন বৈদ্যুতিন মাধ্যম আর সুলভ টেলিফোনের কল্যাণে দেশ তথা কলকাতা বা বাড়ির সঙ্গেও যোগাযোগ থাকে। সব মিলিয়ে মোটামুটি একটা ছন্দে, সাবলীল ভাবেই সবকিছু চলছে বলে ভাবতেন, জানতেন।

এরমধ্যে যে আবার ফাঁক আছে, জটিলতা আছে, সুদীপার কখনও সেসব মনে করারই অবকাশ জোটে নি।

কিন্তু না, সেই লোকটা চলে যাওয়ার পরে, খুব আস্তে আস্তে, ক্রমশ, সুদীপার মতো সহজ-সরল ঘরোয়া মহিলা-বউমা-কেও যেন বুঝতে হচ্ছে, জীবনযাপনকে যত সহজ-মসৃন ভেবে এসেছেন এতোকাল, ব্যাপারটা ঠিক সেরকম নয়। একা রজতাভই বোধহয় আপনা আপনি নিজের উপস্থিতি দিয়ে আগল দিয়ে রাখতেন নানাদিকে। সচেতন ভাবে কোনোদিন সেসব জানার প্রয়োজনই বোধ করেন নি সুদীপা।

এখন প্রতিদিনই বুঝি একটু একটু করে টের পান, মানুষটার অভাবে জীবন-সংসার-সমাজ সম্পর্কে তাঁর চোখ ফুটছে। অভিজ্ঞতার বিস্তৃতি ঘটছে.... ঘরে-বাইরে সর্বত্রই মানুষ থেকে শুরু করে কতকিছুরই যেন পুণর্মূল্যায়ণ করতে হচ্ছে। তার অনেককিছুর মধ্যে মুগ্ধ বিস্ময় মিশে থাকলেও সব অভিজ্ঞতা সুখের নয়। কত অপরিচয়, অজানা অন্ধকার ছিল নিজের মধ্যেও.... আরও কত আছে....! ভাবনার রাশ টেনে ধরলেন সুদীপা। না, এলোমেলো হলে চলবে না।

একটা একটা বিষয় ধরে, যতখানি তাঁর জানা-বোঝার দরকার, ততখানি জেনে-বুঝে নিতে হবে আগে। তারপর সেই বিষয়ে নতুন কিছু করা বা ভাবনার অবকাশ আছে কিনা.... পরে দেখা যাবে। বিষয় তো একটা নয়। অনেকগুলো।

নিচু করা টেবলল্যাম্প্ ডেস্ক-এর ওপর টেনে নিলেন সুদীপা। আগামীকাল পেনশন ডিপার্টমেন্টের লোক আসবে বাড়িতে। সব বুঝেশুনে নেওয়ার জন্য তাঁকেও কিছুটা হোমওয়ার্ক করে রাখতে হবে।

(৫)

শেষ পর্যন্ত বছর পার করে জানুয়ারী মাসের ষোল তারিখে কলকাতা যাওয়ার টিকিট কাটলেন সুদীপা।

আরও আগেই যাওয়ার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু পুরো ডিসেম্বর মাস ধরে টিকিটের দাম দেখে চক্ষু চড়কগাছ। ইদানীং কম্পিউটর নাড়াচাড়া করতে করতে এসব শিখে ফেলেছেন সুদীপা। এয়ারলাইনস্-এর নাম দিয়ে সম্ভাব্য তারিখ, কোত্থেকে কোথায় যাবেন.... ইত্যাদি লিখে ক্লিক করলেই সব জানা যায়। তারপর কার্ড নাম্বার ইত্যাদি দিয়ে, ইচ্ছে করলে বুক করাও যায়।

কিন্তু প্রথমেই অতটা সাহস করেন নি সুদীপা। টিকিটের দাম দেখার পরেই চেনা ট্রাভল এজেন্সিকে ফোন করেছিলেন। মিসেস চ্যাটার্জি নামের সেই ট্রাভেল এজেন্টই পরামর্শ দিয়েছিলেন, খুব আর্জেন্ট না হলে, ডিসেম্বর মাসটা বাদ দিয়েই যান না। সুদীপা ভেবে দেখেছিলেন। সত্যিই তো, তাঁর তাড়াহুড়োর দরকারটাই বা কী!

ডিসেম্বরে গেলেও একা, জানুয়ারীতেও তাই। এতো বছর ধরে দুজনে যখন গেছেন, কিংবা ছেলেমেয়ে ছোট থাকতে ওদের নিয়ে, তখন নিরুপায় হয়েই বছরের নির্দিষ্ট দিনে যাতায়াত করতে হয়েছে। কেননা সকলেরই ছুটির সময় বাঁধা। আর এখন.... তিনি একা মানুষ, বাঁধাহীন.... নিজের ইচ্ছেতেই তাঁর চলা।

চকিতে একবার মাথায় এসেছিল — কথাটা সত্যি কি? একা মানুষ হলেও সত্যিই কি তিনি পুরোপুরি স্বাধীন! কিংবা, পুরোপুরি নিজের ইচ্ছে আর প্রয়োজন অনুযায়ী সবকিছু করতে পারেন! কোন বাঁধনই কি তাঁর নেই! নাহ, একা হয়ে গেলেই তিনি যে সম্পূর্ণ স্বাধীন নন, সে কথাটা বিগত সাড়ে তিনমাসে একটু একটু করে বুঝেছেন সুদীপা। জীবনের কোনো

অবস্থাতেই মানুষ পুরো স্বাধীন হতে পারে না। বাধা . . . . অধীনতা . . . . এসবই নিজের মধ্যেই থাকে। . . . . যাক্ তবে এই ভাবনা এবং বোধের সঙ্গেই আর একটা ব্যাপার টের পাচ্ছিলেন সুদীপা।

রজতাভ চলে যাওয়ার পরে, একেবারে প্রথম দিকে তাঁর যেরকম একা-একা পাগল-পাগল লাগছিল . . . . রাতগুলো দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর মনে হচ্ছিল, নৈঃশব্দ্য আর নির্জনতা ঘিরে ধরেছিল চতুর্দিক থেকে . . . . কিছুটা যেন সয়ে এসেছে সেই ব্যাপারগুলো।

আসলে সবই আছে জানেন। একাকীত্ব, নিঃসঙ্গতা। শীতকাল আসার সঙ্গে সঙ্গেই মেঘলা আকাশ শুষে নিচ্ছে দিনের আলো। কনকনে ঠান্ডা হাওয়ায় কাঁপছে ধূসর প্রকৃতি। কয়েকবার তুষারপাতও হয়ে গেছে। কিন্তু এসবের মধ্যেই তাঁকেও বেরুতে হয়েছে। নিজের ছোটখাট কেনাকাটা, বাজার দোকান ছাড়াও, বেরুতে হয়েছে অফিসিয়াল কাজে। ব্যাংকের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে হয়েছে নানান বিষয়ে, ল-ইয়ারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হয়েছে। গাড়ির উইন্স্টার চেক, বাড়ির কিছু কিছু কাজ, একটা নতুন টেলিভিশন কেনা, আগামী কয়েকমাসের জন্য বাগানটাকে পরিষ্কার করানো, নিজের দু-একটা ছোটখাট শারীরিক সমস্যার জন্য জিপি-সার্জারিতে যাওয়া . . . . একের পর এক কোত্থেকে সব এসে পড়ে . . . . !

হঠাৎ হঠাৎ নিজেই যেন অবাক হয়ে যান . . . . তাই তো দিন এসেছে আর গেছে ! কখন কেটে গেছে যেন টেরই পান নি। কাজের দায় আর বাঁধন সুদীপাকে টেনে বার করেছে বাইরে। রজতাভ নেই, কিন্তু অনেক কাজ রেখে গেছেন তাঁর জন্য। আর সেইসব কাজ সারতে সারতেই তো তাঁর বছরটা শেষ হয়ে যাচ্ছে প্রায়। তাহলে আর বেশি টাকা দিয়ে টিকিট কেটে দেশে যাবেন কেন ! ট্রাভেল এজেন্টকে বলেছিলেন, ঠিক আছে . . . . আপনি দেখুন . . . . প্রাইসটা কমলেই যাব।

মিসেস চ্যাটার্জি চেনেন সুদীপাদের। বলেছিলেন, জানুয়ারীর সাত-আট তারিখ থেকেই টিকিটের দাম পড়তে শুরু করে . . . . আপনি আরও এক সপ্তাহ পরে যান . . . . আমি খুব রিজনেবল প্রাইসে আপনার জন্য . . . . ।

সেই ষোলই জানুয়ারী আসতে এখনও তেইশ-চব্বিশ দিন বাকি। অথচ সুদীপার মনে হচ্ছে, একদিক থেকে বোধহয় ভালই হয়েছে . . . . কেননা প্রায় মাস দুয়েকের জন্য ঘরবাড়ি সব ফেলে রেখে কলকাতা গেলে, যাইহোক না কেন একটা উদ্বেগ থাকবেই। এমনকী দেশে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেও, তার আগে অনেক ব্যবস্থা করার আছে এখানেও। একটা না, মাথায় ঘুরছে হাজারটা ভাবনা। ব্যক্তিগত, সাংসারিক বা পারিবারিক . . . . অর্থনৈতিক সামাজিক . . . . । রজতাভর প্রয়াণের সাড়ে তিনমাসের মধ্যে একক জীবনে যেন সময়ের তুলনায় অনেক বেশিই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন সুদীপা। আর অভিজ্ঞতার সঙ্গে বেড়েছে দায়িত্ববোধ।

অনেক আগেই রবিন একদিন সতর্ক করেছিল মাকে। তোমার হাতে এখন অনেক টাকা আসবে . . . . সতর্ক থেকো। সুদীপা এমনিতেই অসাবধানী মহিলা নন। হাতে টাকা পয়সা আসবে সেটাও জানতেন। কিন্তু পরিমান কতো আর কিভাবে তার উপযুক্ত বিলিবন্টন, ব্যবহার করবেন তা জানা ছিল না। এখনো অনেকটাই জানেন না। কিন্তু বহু বছর এদেশে থাকা, সাধারণ জ্ঞান এবং একসময়ে ইকনমিকস্ অনার্স পড়ার কল্যাণে কিছুটা আন্দাজ অবশ্যই হয়েছে।

সরকারী পেনশন ডিপার্টমেন্টের অফিসার মিসেস্ জনসন বাড়ি বয়ে সুদীপার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন তিন সপ্তাহ আগে। এদিকে ডিসেম্বর মাসের আগে থাকতেই শান্ত-নিবিড়-শীতল ঘুমন্ত দেশটা যেন হঠাৎ ঝলমলে আলো আর রঙ্গীন সাজে সেজে উঠতে শুরু করেছিল। আসন্ন ক্রিসমাস আর বর্ষবরণের উৎসব শুরু হয়ে গেছে। রাস্তাঘাট-দোকান বাজার আর ঘরে ঘরে জ্বলে উঠেছে আলোর মেলা। পার্কে, বাগানের, গাছে গাছে রোশনাই। নিঝুম ঠান্ডার মধ্যেই দেশজুড়ে আলোর বন্যা। হিমেল হাওয়া বইছে অহরহ। তার মধ্যেই ছুটি ছুটি ভাব। পথেঘাটে - দোকানে - সিটি সেন্টারে উপছে পড়া মানুষের ভিড়। চলছে গান বাজনা। কনজারভেটারিতে বসে, কফির কাপে চুমুক দিয়ে মিসেস্ জনসন বলেছিলেন, মিসেস্ রয়, হাউ আর য়্যু গোয়িং ? সুদীপা অনুমান করেছিলেন, ভদ্রমহিলার বয়স তাঁর কাছাকাছিই হবে এবং সম্ভবত ইচ্ছে করেই একজন মহিলা অফিসারকে তাঁর কাছে পাঠানো হয়েছে, যাতে তিনিও সহজ হতে পারেন। সত্যিই তাই।

ভদ্রমহিলার আন্তরিক, অমায়িক, শান্ত — কথোপকথনে তৃপ্তি পেয়েছিলেন সুদীপা। বলেছিলেন, আপনি তো বুঝতেই পারেন, আমার কোনো চয়েস নেই .... কোপ-আপ করতেই হবে।

সেটাই ঠিক মিসেস রয়। ভদ্রমহিলা বললেন। যদিও ব্যাপারটা খুবই কঠিন। তাহলেও এই এ্যাটিচুডটা জরুরী। সুদীপা বললেন, আমার স্বামী হঠাৎ চলে গেছেন .... আমি প্রস্তুতির কোনো সুযোগ পাইনি।

আই নো। মিসেস জনসন বললেন, তারপরেও আপনি যেভাবে এ্যাডজাস্ট করছেন তা প্রশংসাযোগ্য।

কী করব বলুন .... আমার ছেলেমেয়ে এখনও অনেকটা ডিপেন্ডেন্ট।

আরও কয়েকটা ছোটখাট পারিবারিক এবং ছেলেমেয়ের খবরাখবরের পরে সোজাসুজি হিসেবনিকেশ এবং কাজের কথায় ঢুকে পড়লেন ভদ্রমহিলা।

মিসেস রায়, একজন গভর্ণমেন্ট অফিসারের মৃত্যুর পরে তাঁর ওয়াইফ হিসাবে আপনি কি এবং কত বেনিফিট পাবেন, তা কি জানেন?

সুদীপা বিনীতভাবে বললেন, আমার জানাটা যথেষ্ট নয় বলেই আমার ধারণা। আপনি যদি ব্যাখ্যা করে বলেন ....।

মিসেস জনসন মাথা দুলিয়ে বললেন, অফকোর্স। সেই জন্যই পেনশন দপ্তর থেকে আমাকে তো পাঠানো হয়েছে। বেসিক্যালি আপনি থ্রুআউট ইয়োর লাইফ আপনার স্বামীর পেনশনের অর্ধেক এ্যামাউন্ট পেয়ে যাবেন। সেটা কত হবে?

এগজ্যাকট্‌লি বলতে পারব না। কথা বলতে বলতেই ফাইলে চোখ রাখলেন মহিলা। পাতা উলটে বললেন, সেটা ডিপেন্ড করে — আপনার স্বামী কতবছর ন্যাশানাল হেলথ্ সার্ভিসে কাজ করেছেন এবং মৃত্যুর আগে তিনি কত স্যালারি পেতেন তার ওপর। সুদীপা বললেন, আমি যতদূর জানি .... আমার স্বামী আটাশ বছর এন এইচ এস-এ কাজ করছেন। য়্যু আর রাইট। আটাশ বছর, চারমাস, সতের দিন।

আমাদের বিয়ে হয়েছে সাতাশ বছর।

একটা শ্বাস ফেলে ভদ্রমহিলা বললেন, ইয়েস .... ইটস্ আ লং টাইম ....। একটু থেমে আবার যোগ করলেন, ওঁর পেনশনের অর্ধেক হিসাবে আপনি মোটামুটি চোদ্দশ-পাউন্ডের মতো প্রতিমাসে পাবেন।

সুদীপা কিছু না বলে মাথা নাড়লেন।

মিসেস জনসন সঙ্গে সঙ্গেই বললেন, কিন্তু তাইতে আপনার হতাশ হওয়ার কিছু নেই কিন্তু।

সুদীপা বললেন, হলেই বা কী করার আছে!

অনেক কিছু আছে মিসেস রয়। আপনি কি জানেন, এককালীন কতটাকা পাবেন? এবং সেটা ট্যাক্স-ফ্রি!

আসলে ওটাই তো আমার সিকিউরিটি মানি। এ্যামাউন্টটা কত হবে?

যতদূর বলতে পারি .... একলক্ষ বত্রিশ হাজার পাউন্ড-এর মতো। .... হ্যাঁ মিসেস রয়, এটাই আপনার সিকিউরিটি মানি .... এটাকেই কেয়ারফুলি ইউটিলাইজ করতে পারলে ....। এটাকে আমরা বলি লামপ্‌সাম এ্যামাউন্ট .... সুদীপার মনে আছে, মিসেস জনসনের পরের কথাগুলো আর তাঁর কানে যাচ্ছিল না।

একসঙ্গে বেশ কিছু টাকা তিনি হাতে পাবেন জানতেন। দেশে-বিদেশে সব চাকুরিজীবীরাই পেয়ে থাকেন। দেশে বহু মানুষই অবসর গ্রহণের পরে, সেই একলপ্তে পাওয়া অর্থের সুদে জীবন যাপনের অনেকটা অতিবাহিত করেন। কিন্তু রানির দেশে ব্যাংকে টাকা রাখার সুদ এতোই কম যে কেউই তার ওপর নির্ভর করতে পারে না। কিন্তু অন্যভাবেও বিনিয়োগের

সুযোগ আছে। সে ব্যাপারে সুদীপার প্রত্যক্ষ জ্ঞান, অভিজ্ঞতা না থাকলেও, তা যে আহরণ করা সম্ভব সে বিশ্বাস তাঁর আছে।

তাছাড়া লামপ্সাম টাকার পরিমাণ শুনেও মনে মনে তাঁর আশান্বিত হওয়ার কারণ আছে। বহুদিনের অভ্যাসের মতোই মুহূর্তেই তাঁর হিসেব হয়ে গেছে, ভারতীয় টাকার হিসাবে অন্তত এককোটি কুড়ি-পঁচিশ লক্ষ টাকা তিনি পাবেন। এবং ভারতীয় মুদ্রায় পেনশনের পরিমাণও মাসে মাসে একলক্ষ কুড়ি হাজার টাকার মতো অবশ্যই হবে। কোনোটাই কম না। মিসেস্ জনসন-এর কথায় চমক ভেঙ্গে দিল সুদীপার।

মিসেস রায়, আমার ধারণা আপনার আরও কিছু বেনিফিট পাওয়ার আছে।

সুদীপা মাথা নেড়ে বললেন, হ্যাঁ . . . . আমার স্বামী কয়েকটা স্কিম-এ ইনভেষ্ট করেছেন . . . . ব্যাংক আমাকে জানিয়েছে।

ডক্টর রয় প্রাইভেট পেনশন স্কিমেও টাকা রাখতেন। তাছাড়া আপনি ইন্সিওরেনস্ থেকেও টাকা পাবেন। আপনার কি কোনও ফাইনানসিয়াল এ্যাডভাইসর আছেন ?

সুদীপা একটু ভেবে বললেন, বন্ধুবান্ধব আছেন . . . . কিন্তু প্রোফেশনাল সেরকম কেউ নেই।

আমার মনে হয় . . . . এ বিষয়ে আপনার প্রোফেশনাল লোকের সঙ্গে কথা বলাই ভাল। ব্যাংক-ও আপনাকে এ্যাডভাইস করতে পারবে। তাড়াহুড়োর কিছু নেই। বাই দ্য ওয়ে, আপনাদের এই বাড়ির মর্টগেজ দিতে হয় কি ?

অফকোর্স . . . . সত্যি বলতে কি মিসেস্ জনসন, সেটার কথা ভেবেই আমার বুক শুকিয়ে যাচ্ছে . . . .।

ওটা নিয়ে আপনি এখন উতলা হবেন না মিসেস রয়।

কেন বলছেন সে কথা ?

কেননা, ডক্টর রয় যদি মর্টগেজ ইন্সিওরেন্স করিয়ে রেখে থাকেন, তাহলে . . . . পসিব্লি এ বাড়ির জন্য আপনার আর কোনও লোন থাকবে না . . . . মর্টগেজ ও দিতে হবে না . . . . আপনি একা বাড়ির ওনার হয়ে যাবেন।

এ ব্যাপারেও সুদীপার যে একটা ভাসা ভাসা ধারণা নেই, তা নয়। কিন্তু প্রকাশ করলেন না সেটা। বললেন, তা যদি উনি করে গিয়ে থাকেন . . . . তাহলে অবশ্যই আমার দুর্ভাবনা অনেকটা কমে যাবে। কী করতে হবে আমাকে ?

ভেরি সিম্প্‌ল। মর্টগেজ ফাইল থেকে আপনি নিজেই সব পড়ে নিতে পারেন। আদারওয়াইস . . . . জাস্ট মেক এ্যান এ্যাপয়েন্টমেন্ট উইথ দ্য ব্যাংক . . . . মে বি ওঁরা ইতিমধ্যে সব পেপারস রেডি করেই ফেলেছেন।

সুদীপা কিছু না বলে মাথা নাড়লেন। প্রায় মাস তিনেক কোনো কিছুই বিশদভাবে দেখার মানসিকতা তিনি তৈরি করতে পারেন নি। কাগজপত্র-ফাইল উল্টেছেন, কিন্তু পূর্ণ মনঃসংযোগ করতে পারেন নি। ভাবনা আর দৃষ্টির দখল নিয়েছেন রজতাভ। উদ্বেগ গ্রাস করেছে। নিঃসঙ্গতা পর্যবাসিত হয়েছে ত্রাসে। দেশের কথা মনে হয়েছে বারবার।

মিসেস জনসনই প্রশ্ন করলেন আবার।

আপনি নিজে কোনোদিন এদেশে কাজ করেন নি মিসেস রায় ?

ছাড়িয়ে যাওয়া ভাবনা থেকে ঘরের পরিবেশে ফিরলেন সুদীপা। বললেন, কাজ ! হ্যাঁ . . . . একেবারে করিনি তা নয় . . . . কিন্তু সে তো অনেকদিন আগে . . . . মাত্র দেড়-দু'বছরের জন্য . . . .

অর্থাৎ আপনি ইংল্যান্ডে কিছুদিন অন্তত চাকরি করেছিলেন ?

হ্যাঁ . . . . তাও কুড়ি-বাইশ বছর হয়ে গেছে . . . . ।

কোথায় কাজ করতেন আপনি ?

নর্থ ইয়র্কশায়ার কাউনসিলে . . . . ফাইনান্স ডিপার্টমেন্ট এ . . . . ।

মিসেস জনসন রীতিমত উৎসাহী হয়ে বললেন, সেই কাজের জায়গা থেকে আপনি কোনো বেনিফিট নিয়েছেন কখনও ?

না তো ! চাকরি করার সময় মাইনে পেতাম . . . . ছেড়ে দেওয়ার পরে আর যোগাযোগ রাখি নি ।

আপনি কি জানেন, এই কাজের জন্য আপনি কিছু লাম্পসাম এবং যাহোক কিছু পেনশনও পাবেন !

এই সম্ভবনার ব্যাপারটা সত্যি মাথায় ছিল না সুদীপার । আসলে সেই আশির দশকের শেষে তিনি যে একসময় চাকরি করতেন এদেশে, সে কথাটাই তো প্রায় ভুলতে বসেছিলেন । মনে পড়ল, চাকরি ছেড়ে দেওয়ার পরে প্রথম-প্রথম কিছুদিন এটা সেটা কাগজপত্র পাঠাতো কাউন্সিল অফিস থেকে । সুদীপা খুলে দেখার আগ্রহও ধরে রাখতে পারেন নি । প্রয়োজনও অনুভব করেন নি ।

মিসেস জনসন-এর কথা শুনে বললেন, আমায় কী করতে হবে এখন ?

আপনার কোনো পুরনো পে-স্লিপ . . . . ট্যাকস্ ফর্ম . . . . কিছু আছে ?

খুঁজে দেখলে হয়তো . . . . পাবো ।

অবশ্য না পেলেও . . . . আপনার ন্যাশেনাল ইন্সিওরেন্স নম্বর দিলেই হবে . . . . পেনশনটা আপনার কোন বয়েস থেকে ওরা দেবে জানি না । কিন্তু আমি আপনাকে এ্যাডভাইস করব, আগে আপনি সব পরিস্থিতি জানিয়ে কাউন্সিলে একটা চিঠি লিখুন . . . . এবং কবে, কী কাজ করতেন, করেছেন সব উল্লেখ করবেন । তারপর লিখবেন কী বেনিফিট আপনি পেতে পারেন . . . . ।

জানালা দিয়ে বাইরে রাস্তার দিকে চোখ যেতেই সচেতন হলেন সুদীপা । সময় বসে থাকছে না । বেরুতে হবে ।

কনকনে নিঝুম রাস্তার মধ্যেই ঈশ্বরের করুণার মতো একফালি সূর্যের আলো প্রকাশিত হয়েছে আজ । ক্রিসমাসের দুদিন আগে এমন আলোক দর্শন বিরল ঘটনাই বটে । তবে নিশ্চয়ই তা অতি সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য । আবার ধূসর মেঘে ঢেকে যাবে আকাশ । সকাল ন-টাকে মনে হবে স্যাঁতানো পড়ন্ত দিন । কিন্তু যেমনই হোক, সুদীপাকে বেরুতে হবে ।

মিসেস জনসন-এর সঙ্গে প্রায় সপ্তাহ তিন আগে সেই আলোচনা এবং কথোপকথনের পরে কিছুটা ব্যস্ততা বেড়ে গেছে । মনের অবস্থা যেমনই থাকুক না কেন, বাস্তবতাকে মানতে হবে এবং নিজের কাজ যথাসম্ভব নিজেকেই সারতে হবে । আর একটা ব্যাপারও বুঝেছেন সুদীপা, এইসব অর্থনৈতিক বিষয়ে ছেলেমেয়েকে তিনি জড়াবেন না । রঞ্জনা তথা মুনিয়াকে জড়ানোর কোনো প্রশ্নই ওঠে না, কেননা এখনও সে ছাত্রী । ওদিকে রবিন-এর পরিস্থিতি নিজের পায়ে দাঁড়ানোর মুখে । সুদীপা জানেন, আগামী কয়েক মাসের মধ্যে পরিপূর্ণ সলিসিটর হিসাবে জীবিকায় থিতু হবে ছেলে । হয়তো লন্ডনের যে ফার্মে ও ইন্টার্নশিপ করছে, সেখানেই নিয়মিত চাকরি পেয়ে যাবে; অথবা ও নিজের স্বাধীন প্র্যাক্টিশও করতে পারে ।

কিন্তু যেটাই করুক, সুদীপা আশা করেন, নিজের জীবন, কাজ সবকিছু নিয়ে রবিন নিজেই সিদ্ধান্ত নেবে । রজতাভ-ও তাই চাইতেন । শেষ পর্যন্ত যাবতীয় পারিবারিক বিষয় আশয় সব ছেলেমেয়ের জন্যই, কিন্তু প্রথম থেকে তাদের নির্ভর করার মানসিকতা যেন গড়ে না ওঠে ।

রজতাভর রেখে যাওয়া যাবতীয় ফাইল, খাতাপত্র, ব্যাংকের বই সুদীপা নিজেই দেখতে শুরু করেছিলেন । অধিকাংশ জায়গাতেই তাঁদের যে জয়েন্ট-এ্যাকাউন্ট সুদীপার তা জানাই ছিল । এবার বার্চভিউ ক্লোজ-এর এই বাড়ির জন্য ইন্সিওরেন্স

কভার থাকায়, তাঁকে যে আর মর্টগেজ দিতে হবে না, সেটা দেখেই স্বস্তির শ্বাস ফেলেছেন সুদীপা। ওদিকে অন্যান্য সঞ্চয়ের আয়-ও তাঁর নামে পরিবর্তিত হয়ে যাবে। লয়েডস ব্যাংক-এর সঙ্গে কথা বলেছেন সুদীপা। সাড়ে দশটায় তাঁর এ্যাপয়েন্টমেন্ট।

তাছাড়াও আজ কিছু বাজার-দোকান, কেনাকাটা আছে। ঘনিষ্ঠ এবং বন্ধুভাবাপন্ন তিনটি দম্পতিকে ওবেলা বাড়িতে ডেকেছেন সুদীপা। সুনন্দন-বিদিশা তো আছেনই, মিডলস্‌বরা আর হার্টলেপুল থেকে আসবেন জয়া-সৌমেন, মুমা আর বাপ্পা। পিটার্লির শুভংকরদার স্ত্রী রমা ইতিমধ্যেই কলকাতা চলে গেছেন। হয়তো শুভংকর পাল একা আসবেন। রজতাভ চলে যাওয়ার পরে এতোদিন কাউকেই বাড়িতে ডাকেন নি, ডাকতে পারেননি সুদীপা। এবার কলকাতা যাওয়ার আগে, এবং ক্রিসমাস-এর কাছাকাছি সময়ে কিছুটা যেন নিয়ম রক্ষার মতোই কয়েকজনকে ডেকেছেন। ডাকাডাকির দরকারও আছে। সামাজিকতার নিয়ম।

কিন্তু অল্প কয়েকজনকে ডাকলেও, তাঁদের আপ্যায়নের আয়োজন করতে হবে একা হাতেই। রজতাভ থাকলে দুজনে একসঙ্গেই .... যাক্। রান্নাঘরের ছোট্ট ডাইনিং টেবিলের ওপর শেষ-না-হওয়া কফির মগ নামিয়ে রাখলেন সুদীপা। ফ্রিজের দিকে এগিয়ে গেলেও, দেয়ালে আটকানো ঘড়ির দিকে চোখ পড়ল। নটা দশ হয়ে গেছে। ঠিক আছে.... তাড়াহুড়ো নেই। বাড়ি থেকে ব্যাংকে পৌঁছাতে দশ মিনিটের বেশি লাগবে না, গাড়ি পার্কিং-এর জায়গাও পাওয়া যায় ওই সময়।

দুটো নিরামিষ পদ আগেই রান্না করে রেখেছেন সুদীপা। ব্রকোলি-বেগুন-কুমড়ো-আলু, আর কালোজিরে সরষে বাটা দিয়ে ট্যাঁড়স-ঝাল। অড়হর ডালও করে রেখেছেন হিং দিয়ে। মাছটা জয়া রান্না করে আনবে নিজে থেকেই বলেছে। তাহলেও স্টার্টার হিসেবে তন্দুরি চিকেন, ল্যাম্ব এবং চাটনিটা করতে হবে সুদীপাকে দুপুরে ফিরে। অসুবিধে হবার কথা নয়। চারটে থেকে দিনের আলো নিবে যেতে শুরু করলেও, সাড়ে ছটা সাতটার আগে কেউ আসে না। মিষ্টি বিদিশা নিয়ে আসবে বলেছে।

ফ্রিজ খুলে দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিলেন সুদীপা। চিকেন ড্রামস্টিক আর ল্যাম্ব ছাড়াও কী-কী আনতে হবে দেখে নিলেন। নাহ্ শুধু মনে রাখার ওপর নির্ভর করলে চলবে না। ফ্রিজ বন্ধ করে ফিরে এলেন ডাইনিং টেবিলে। রেফ্রিজারেটরের তাকের ওপর থেকে রাইটিং প্যাড আর পেন নিয়ে বসলেন। রান্নাঘরটাই তো আসলে পুরো সংসারের একটা সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। আভেন-কুকার-কাবার্ড-সিংক্-বেসিন-কল ছাড়াও আছে টেলিফোন-টেলিভিশন-দেয়াল ঘড়ি, ফ্রিজ-ক্লিনার, বাসনকোসনের জায়গা, কাটলারির ড্রয়ার, ওয়াইন র‍্যাক, গোপন কাবার্ডে বিভিন্ন রান্নার বই, ডাল-তেল-মশলা রাখার পাল্লা-ঢাকা কুঠরি ... কী নেই রান্নাঘরে! তাছাড়াও ঘরের লোকের বসে খাওয়ার মতো ছোট ডাইনিং টেবিল, চারখানা চেয়ার ....।

দ্রুত হাতে বাজারের ফর্দ লিখে ফেললেন সুদীপা।

কানে গেছে লেটার বক্সে চিঠি ফেলার শব্দ, পোষ্টম্যান চিঠি বিলি করে চলে গেল। আগে এসব নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। ইদানীং উদগ্রীব হয়ে থাকেন। গুরুত্বপূর্ণ চিঠি আসে পেনশন দপ্তর, ব্যাংক আর ইনল্যান্ড রেভিনিউ থেকে। কখনও বিভিন্ন ফর্ম কমপ্লিট করার নির্দেশ আসে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে। আবার ফালতু চিঠিও কম আসে না। কিভাবে যে বিনিয়োগের কোম্পানিগুলো জানতে পারে যে তাঁর হাতে অনেক কাঁচা টাকা এখন কে জানে! নাহ্ সেগুলোর স্থান সোজা বিন্-এর মধ্যে। গাড়ির কোম্পানি এবং ডোনেশন চেয়েও অনেক চিঠি আসে।

চার-পাঁচটা খামের মধ্যে সান্ডারল্যান্ড কাউন্সিল থেকে আসা সাদা খামটার দিকে দৃষ্টি আটকাল সুদীপার। সেই অনেক বছর আগে তাঁর কর্মস্থলের চেনা খাম। মিসেস্ জনসন-এর পরামর্শ অনুযায়ী কাউন্সিলে চিঠি লিখেছিলেন সুদীপা দিন দশেক আগে। তারই উত্তর এসেছে।

কিন্তু না .... এখন বেরুনোর ব্যস্ততা নিয়েও চিঠি পড়া যাবে না। সময় নিয়ে বসে, ধীরেসুস্থে পড়বেন। আজ নয়, হয়তো কাল। রান্নাঘরের তাকেই জমে না-পড়া চিঠি। পেপার ওয়েট চাপা দিলেন সুদীপা। স্নান সেরে বেরুনর সময় আছে। কী পোশাক পরবেন! ট্রাউজারস-পুলওভারের সঙ্গেই একটা লংকোট-ও চাপাতে হবে। একটা লেডিস হ্যাট-ও নিতে হবে।

কিন্তু রান্নাঘর থেকে বেরুতে গিয়েও পারলেন না। ফোন বাজছে। রিংটোন-টা ইন্টারন্যাশেনাল কল-এর। অর্থাৎ কলকাতা থেকে কেউ ফোন করছে। আপনা থেকে সময়ের হিসেব হয়ে গেল। সাড়ে পাঁচ ঘন্টার তফাৎ হলে কলকাতায় এখন বিকেল তিনটে বাজে। বাড়ির কেউ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

কিন্তু কোন বাড়ির। শ্রীরামপুরের শ্বশুরবাড়ি . . . . নাকি লেকগার্ডেন্স-এর নিজেদের বাড়ি থেকে !

ভাবতে-ভাবতেই ফিরে এসে টেলিফোন ধরলেন সুদীপা। — হ্যালো !

অবাক হলেন অচেনা মধ্যবয়স্ক কণ্ঠস্বর শুনে। আপনি আমাকে চিনবেন না ম্যাডাম . . . . আমি কোলকাতা থেকে ফোন করছি।

কে আপনি ? আপনার নাম কী ?

আজ্ঞে আমি একজন আইনজীবী . . . . আমার নাম দেবকান্ত মিশ্র।

আমাকে আপনি টেলিফোন করেছেন কেন ?

ভদ্রলোক প্রশ্নটার পাশ কাটিয়ে বললেন, মিসেস রায়, আপনি কম্পিউটার ব্যবহার করেন তো ? ইমেল দ্যাখেন নিশ্চয়ই ? সুদীপা যেন ভদ্রলোকের কথার টানেই বলে গেলেন, হ্যাঁ . . . . তা তো দেখি . . . . কিন্তু আপনি তা জানতে চাইছেন কেন ?

সুদীপাকে শেষ করতে না দিয়েই ভদ্রলোক বললেন, কাইন্ডলি আপনি সময়মতো কম্পিউটারটা খুলে আমার মেলটা দেখবেন . . . . তাহলেই সব প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবেন।

কিন্তু আপনি একজন লইয়ার . . . . কলকাতা থেকে . . . . !

নমস্কার ম্যাডাম . . . . ইমেলটা দেখবেন . . . . ভাল থাকবেন . . . . ছাড়ছি। বাই-বাই।

সুদীপার হাতে ধরা অবস্থাতেই টেলিফোনটা কেটে যাওয়ার শব্দ পেলেন। সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত বোধ করলেন হ্যান্ডসেট-টা ক্র্যাডেলে রাখতে রাখতে। না, শুধু বিভ্রান্তি নয় . . . . কেমন একটা দুর্ভাবনা আর অশান্তিও যেন মিশে যাচ্ছে . . . . । উকিলের ফোন কেন ! কিন্তু হাতে বেশি সময় নেই সুদীপার। কম্পিউটারও এখন খুলতে পারবেন না। বস্তুত কালকের আগে কিছুই হবে না। মনে অস্বস্তি নিয়েই দোতলায় তৈরি হতে গেলেন সুদীপা।

(চলবে)

প্রখ্যাত সাহিত্যিক **নবকুমার বসু** ইংল্যান্ডের বাসিন্দা। ''চিরসখা'' সহ অনেক জনপ্রিয় উপন্যাস তিনি পাঠকদের উপহার দিয়েছেন। প্রতিভাস প্রকাশিত 'তোমার আঁধার তোমার আলো' তাঁর নবতম উপহার, গত বইমেলায় প্রকাশিত। 'হটাবাহার' তাঁর প্রথম অন্ লাইন ধারাবাহিক উপন্যাস, তিনি বাতায়নের হাতে তুলে দিয়েছেন।

স্মৃতিকথা

সিদ্ধার্থ দে

সুনীল সাগরে

পর্ব ৩

(৯)

মদ্যপানের বিষয়ে সুনীলদার কোন লুকোছাপা বা শুচিবাই ছিল না। বহু লেখায় খোলাখুলি ভাবে তাঁর এই আসক্তির কথা লিখেছেন। কলকাতার রাস্তাঘাটে ইয়ার বন্ধুদের সঙ্গে মধ্যরাতের নানা কীর্তিকলাপের কথা তো সমস্ত সুনীল ভক্তরই জানা।

ব্যক্তিগত ভাবে আমি যাকে বলে social drinker। মাঝে সাঝে সামাজিক মেলামেশায় একটু আধটু গলা ভেজানো মন্দ লাগেনা। যদিও বাড়িতে প্রায় সব ধরণের পাণীয়ই মজুত রাখি, একলা বসে কখনও খাইনা। (সৌভাগ্যবশত দেবদাসের দশা কোনদিনও হয়নি)। আমেরিকাতে একটু বেশী বয়সে ফের ছাত্র হয়ে গিয়ে কিছু কারণে দুটি semester একা ছিলাম। চন্দনা প্রায় নমাস পরে এসেছিল। সেই দিনগুলিতে শুক্র শনিবার রাতে কোন পার্টিতে গিয়ে বেশ কয়েক গ্লাস বিয়ার গিলে বিরহ যাতনা উপশমের ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালাতাম যদিও।

সুনীলদা আসার আগে অবশ্য cellar টা বেশ পরিপূর্ণই রেখেছিলাম। স্হানীয় বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা করে বিয়ার ওয়াইন স্পিরিট সব ধরণের মদই ছিল আমার সংগ্রহে।

যদি কখনো bartender-এর কাজ করতে হয় মনে হয় প্রথম দিন-ই বরখাস্ত হব। মদ পরিবেশন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠিত নিয়মাবলী কিছুতেই মনে রাখতে পারিনা। অবধারিতভাবে কোন গন্ডগোল করে ফেলি। কুলীন বা শৌখিন সুরারসিকদের অনেক রকম কায়দা কানুন আছে। বিয়ারের গ্লাসের একরকম প্রলেতারিয়েত মার্কা চেহারা। উইস্কির গ্লাস আরেক ধরণের – বেশ আভিজাত্য মেশা গাম্ভীর্য আছে চেহারায়। বিভিন্ন ধরণের ওয়াইনের জন্য আবার নির্দিষ্ট গেলাস। লালের গ্লাসের বেশ পেটমোটা, তুলনায় সাদা ওয়াইনের গেলাস কিছুটা জিমে গিয়ে ওজন কমানো শরীর সচেতন যৌবন যায় যায় নারীর মতন। আর শ্যাম্পেনের flute গ্লাস তন্বী 'সিলিম' যুবতীর চেহারা মনে করিয়ে দেয়।

চা জলখাবারের পর সুনীলদাকে একটু ভয়ে ভয়েই জিজ্ঞেস করলাম পাণীয়ের ব্যাপারে। উনি নির্দ্বিধায় উইস্কি দিতে বললেন। তখনই করলাম একটা সেমসাইড গোল। বিয়ারের গ্লাসে উইস্কি ঢেলে ফেললাম ! চন্দনা হাঁউ মাউ করে উঠল প্রত্যাশিতভাবেই।

সুনীলদা মুহূর্তে অবস্হাটা সামলে দিলেন। "শোন সিদ্ধার্থ, ওয়াইনের, শ্যাম্পেনের নির্দিষ্ট গেলাস আছে। উইস্কি কিন্তু যে কোন গ্লাসে খাওয়া যায়, এমন কি ভাঁড়েতেও।"

খালাসিটোলায় পোড় খাওয়া বিশেষজ্ঞ যে আমাকে অপ্রস্তুত অবস্হা থেকে রেহাই দেবার জন্য গপ্পোটি ফেঁদেছিলেন সে বিষয়ে সেদিনও কোন সন্দেহ ছিল না। আদতে নিয়ম ভাঙা মানুষ উনি। উনিই এই ধরণের যা ইচ্ছে নিয়ম বানাতে পারেন।

সাহিত্যের সেই প্রায় Victorian যুগে প্রচলিত নানা সংস্কার ছুঁড়ে ফেলে নরনারীর শারীরিক মিলনের যে রকম বর্ণনা উনি দিয়েছিলেন, যৌবন বয়সে আমাদের গায়ে শিহরণ জাগাতো। এরকম মানুষের কাছে ভাঁড়ে উইস্কি খাওয়া কোন ব্যাপারই নয়।

চলতি ভাষায় একটা কথা খুব চলে: "জাতে মাতাল, তালে ঠিক"। টানা উইস্কির মত কড়া ড্রিঙ্ক খেয়ে যাওয়া সত্ত্বেও কোন সময়ে পা টলতে দেখিনি, বা অসংলগ্ন কথা বলতে শুনিনি। রসিকতা বোধও পুরোমাত্রায় সজাগ ছিল। বাড়িতে সান্ধ্য আসরের দিন কেউ সামনে এক গ্লাস জল রেখে গিয়েছিল। কথা বলতে বলতে উইস্কির বদলে জলের গ্লাসে চুমুক দিয়েই বলে উঠলেন "ওরে বাবা জল কে দিল আবার, নেশা হয়ে যাবে যে!"

মদ্যপানের কথাই যখন লিখছি স্বাতীদির কথাও একটু বলি। উনি খুবই পরিমিত এই ব্যাপারে। তবে অস্ট্রেলিয় ওয়াইনের বেশ প্রশংসা করেছিলেন।

(১০)

সুনীলদার অস্ট্রেলিয়া আসার পর শ্রীমন্তর সঙ্গে প্রায় প্রতিদিন-ই কথা হয়েছে। একটা ব্যাপার জানতে পেরেছিলাম, উনি সকালের দিকে কিছুক্ষণ লেখালেখি করেন। আর লেখেন টেবিলে বসে।

শুনলাম, মেলবোর্নে যে বাড়িতে ছিলেন ওঁদের জন্য নির্দিষ্ট ঘরটিতে কোন টেবিল ছিল না। সে জন্য একটু অস্বস্তিতে ছিলেন। কিছুটা বিরক্তও। তড়িঘড়ি করে ওঁদের যে ঘরে থাকার ব্যবস্হা করেছিলাম সেটির জন্য একটা মাপ মতন টেবিল কিনে আনলাম।

কেনাটা সার্থক হয়েছিল। যে কদিন ছিলেন প্রতিদিনই ব্রেকফাস্টের পরে কিছুক্ষণের জন্য দোতলার ঘরটিতে চলে যেতেন লেখার জন্য। তিনটি সকালই সৌভাগ্যবশত খুব ঝলমলে ছিল।

টেবিলটা রেখেছিলাম জানলার ধারে। আশপাশে বিশেষ বাড়িঘর নেই – বাইরে তাকালে পাশের parkland-এ দেখা যায় ইউক্যালিপটাস গাছের সারি। চারিদিকে সবুজের সমাহার।

শেষদিন একটু ইতস্তত করে স্বাতীদিকে জিজ্ঞেস করলাম কি লিখছেন সুনীলদা। জানলাম পূজা সংখ্যা আনন্দমেলার উপন্যাসটি কিছুক্ষণ হল শেষ করেছেন। সুনীলদাকে জিজ্ঞেস করার সাহস হয়নি – স্বাতীদিকেই ইনিয়ে বিনিয়ে বললাম যদি পাণ্ডুলিপিটা রাখতে পারি। স্বাতীদি বিনা দ্বিরুক্তিতে রাজী। পাণ্ডুলিপিটা সঙ্গে সঙ্গে এনে দিলেন – আর দেরী না করে চটপট ফোটকপি করে নিলাম।

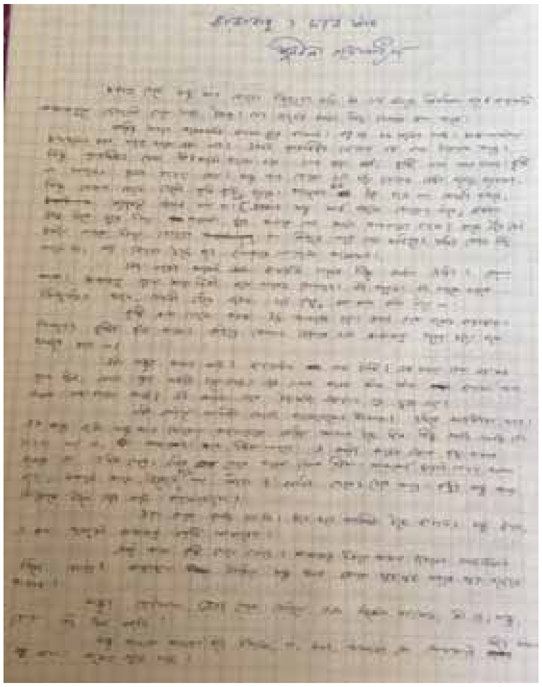

মুক্তোর মত হাতের লেখায় গোটা চল্লিশ পাতার প্যাডের কাগজে লেখা manuscriptটি আমাদের পরিবারের একটি বড় সম্পদ। হিসেব করেছিলাম, দশ ঘন্টার বেশী সময় উনি নেন নি উপন্যাসটি লিখতে – দৈনিক গড়ে আধ ঘন্টা মত সময় পেয়েছেন ধরে নিয়ে। অসাধারণ গতি বটে। এই গুণটির কথা উনি নিজেও লিখেছেন ওঁর অর্ধেক আত্মজীবনীতে। পেট চালানোর জন্য ওঁকে জীবনের এক সময়ে প্রচুর লিখতে হত – সেই জন্য দ্রুত লেখার দক্ষতা আয়ত্ব করতে হয়েছিল। আমার বাবা প্রায়ই বলতেন "একটা মানুষ এমনি এমনি বড় হয় না!" সুনীলদাকে কদিন কাছ থেকে দেখে কথাটির সত্যতা যাচাই হল।

উপন্যাসটির নাম দিয়েছিলেন 'কাকাবাবু ও মরণফাঁদ'। ২০০১

সালের পূজা সংখ্যা আনন্দলোকে প্রকাশিত হয়েছিল। পাণ্ডুলিপির প্রথম পাতা ও ছাপা উপন্যাসটির প্রথম পাতার ছবি তুলে দিলাম কৌতুহলী পাঠকের জন্য।

আমার পুত্র সায়নের জন্ম ১৯৯৪ সালে ব্রাজিল বিশ্বকাপ ফুটবল জেতার পরে পরেই। সে বছরের ব্রাজিলের অধিনায়কের নামেই ওর ডাক নাম রেখেছিলাম ডুঙ্গা। পরে জেনেছিলাম ঠিক ঐ নামেই সুনীলের একটি কাকাবাবু সিরিজের কাহিনী আছে। তাতে অবশ্য ডুঙ্গা কোন মানুষ নয় – একটি ডালমাশিয়ান কুকুর। কোন এক সময় বইটি সংগ্রহ করে পুত্রকে পড়েও শুনিয়েছিলাম। আবার নেপালি ভাষায় নাকি মাউন্ট এভারেস্টের নাম 'ধুংগা'। সুনীলদা বইটিতে (এবং অন্যান্য কাকাবাবুর বইতে সই করে দিয়েছিলেন।)।

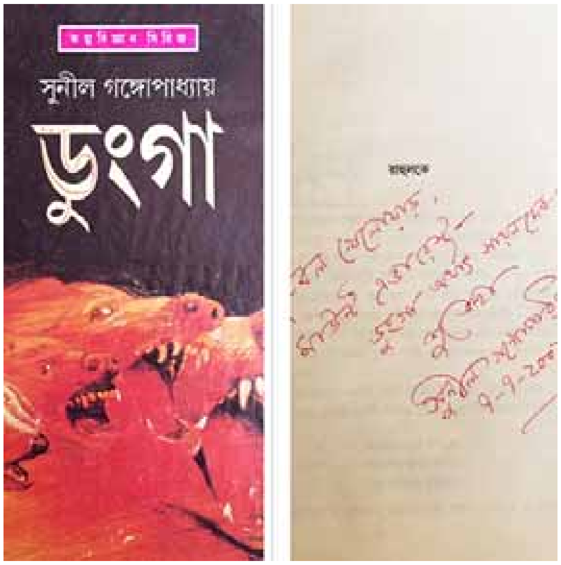

(১১)

সুনীলদার আসার পরের দিন সকাল থেকেই উপলব্ধি হল, আমরা হঠাৎ ভীষণ জনপ্রিয় হয়ে গেছি। ঘনিষ্ট বন্ধুরা তো খোঁজ নিচ্ছেনই – অল্প পরিচিত, অপরিচিত, মায় এড়িয়ে চলা মানুষ অবধি ফোন করে চলেছেন।

ঠিক ছিল শুক্রবার সন্ধ্যায় আমাদের বাড়িতে একটি সান্ধ্য আসর বসবে জনা কুড়ি আমন্ত্রিত অতিথি নিয়ে। কিন্তু নিমন্ত্রিতের সংখ্যা ঘন্টায় ঘন্টায় বেড়েই চলল। আমাদের বসার ঘরটিতে জনা দশেক অতিথি ভালভাবেই বসতে পারেন। বিশ জন চাপাচাপি করে। সংখ্যাটা চল্লিশ ছাড়িয়ে গেলে অবশ্য সেটা চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। সংখ্যাটা সেরকমই দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। সবাই সুনীলদাকে কাছ থেকে দেখতে চান – শনিবারের বারোয়ারী সাহিত্য সন্ধ্যায় তো আর সেটা হবে না। অগত্যা . . .

তবে এই সুযোগে অনেক নতুন মানুষের সঙ্গে আলাপ হল। এঁদের একজন আবদুল চৌধুরী। বাংলাদেশী মানুষদের তরফ দেখে উনি আমাকে সাহায্য করছিলেন। পরিকল্পিত সুনীল সাহিত্য সন্ধ্যার পরিচালনার ভার এঁর উপর ন্যস্ত ছিল। অত্যন্ত পন্ডিত মানুষ। একদিকে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী, অন্যদিকে কবি (বেশ কয়েকটি প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ আছে ভদ্রলোকের)। এছাড়া উনি আবার সৈয়দ মুজতবা আলী সাহেবের নিকট আত্মীয়। সুনীলদা চেহারায় আলী সাহেবের সঙ্গে আবদুল ভাইয়ের অনেক মিল পেয়েছিলেন। ওঁর স্ত্রী টিউলিপের সঙ্গেও পরিচয় হল। বেশ উচ্চপদস্হ সরকারী চাকুরে আবার দুর্দান্ত রান্নাও করেন। বৃহস্পতিবার রাতে সুনীলদা স্বাতীদির সাথে ওঁদের বাড়িতে নিমন্ত্রিত ছিলাম, সেই সুবাদে ওঁর হাতের রান্না খাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল।

আরেকজন মিতুল রহমান। গায়িকা হিসাবে ক্যানবেরাতে সুপরিচিতা। যদিও আগে খুব একটা ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল না ভদ্রমহিলার আকুলতা দেখে নিমন্ত্রণ না করে পারিনি। সুনীলদা মিতুলের গান খুব পছন্দ করেছিলেন। নীচের ছবিটিতে মিতুল গান শোনাচ্ছেন সুনীলদাকে। সুরেলা কন্ঠে "তাই তোমার আনন্দ আমার পর" গানটি সুনীলদা খুব মন দিয়ে শুনছিলেন। পরবর্তীকালে মিতুল আমার ছোট কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়ার গান শেখার ব্যাপারে নানা রকম ভাবে সাহায্য করেছিলেন।

ঐ সময়ে সুনীলের বিশেষ বন্ধু প্রয়াত আয়ান রশীদ খানের কন্যা ফারহা-র সঙ্গেও আমাদের পরিচয় হয়। ফারহা কিছুদিন হল ক্যানবেরাতেই ছিল রুমানিয়ান স্বামী ক্রিশ্চানের সঙ্গে। (সে আরেক গল্প। ক্রিশ্চান কলকাতায় এসেছিল মির্চা এলিয়াদের 'লা নুই বেঙ্গলি' উপন্যাসে মৈত্রেয়ী দেবীর কথা পড়ে ওঁর সঙ্গে পরিচয় করতে। সেই সূত্রেই কোনভাবে ফারহার

সঙ্গে আলাপ, প্রণয় এবং বিবাহ।) একই শহরে বাস করা সত্ত্বেও কলকাতার এই সুন্দরী মেয়েটির সঙ্গে আগে আলাপ ছিল না। আয়ান রশিদ খান ছিলেন কলকাতা পুলিশের উচ্চপদস্থ অফিসার। আদতে আফগান এই মানুষটি বাংলা ভাষায় কবিতাও লিখতেন। সেই সূত্রেই আলাপ সুনীলের সঙ্গে। দুজনের আর একটি বন্ধন ছিল সুরায় আসক্তি । ফারহাকে দেখে সুনীলদা সস্নেহে ‘বাবলি’ নামে সম্বোধন করে জড়িয়ে ধরেছিলেন। এই ভারি মিষ্টি স্বভাবের খানদানি মুসলমান ঘরের মেয়েটির সঙ্গে ওরা আমেরিকা চলে যাওয়া অবধি নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। সুনীলদা এবং ওর বাবার বিষয়ে বেশ কিছু গল্প বলেছিল। আমার বিচারে ঘটনাগুলি কিছুটা ব্যক্তিগত ধরণের, তাই লিখলাম না।

আরও অনেক মানুষের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল সেই কদিনে। যেমন হয়ে থাকে, নিয়মিত যোগাযোগ না থাকায় অনেকের কথাই ভুলে গেছি। তবে ঐ কদিন সুনীল জাদুতে দুই বাংলা মিলে গিয়েছিল।

(১২)

ছোটবেলায় ‘চাঁদের পাহাড়’ কে না পড়েছে ? আমি অন্তত বইটি বার বার পড়েছি। কিশোর মনের কল্পনায় আফ্রিকার জঙ্গলে অবাধে ঘুরে বেড়িয়েছি। হালে অবশ্য এত জঙ্গল, বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত ডকুমেন্টারি দেখেছি যে সেই শিহরণটা আর অনুভব করিনা।

পর্যটক হিসাবে আমি খুবই অলস। দুম করে বেড়িয়ে পড়তে পারি না। চাহিদা আনেক – আরামে যাব, মোটামুটি ভাল জায়গায় থাকব, পছন্দমত খাবদাব। ছোটবেলায় একবার পরিবারের সঙ্গে হাতির পিঠে চেপে কাজিরাঙ্গার সংরক্ষিত অরণ্যে ঘুরেছিলাম। অনেক এক শিঙের গন্ডার দেখেছিলাম মনে আছে। তবে সমরেশ মজুমদারের লেখা পড়ে উত্তরবঙ্গের জঙ্গলে যাবার কিছুটা বাসনা হালে জেগেছে।

সেদিক দিয়ে সুনীলের ভ্রমণ সাহিত্যে যতটা পড়েছি, উনি হুট করে বেড়িয়ে পড়া মানুষ। উত্তর বঙ্গ, অসমের জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানো নিয়ে ওঁর বেশ কিছু উপভোগ্য লেখা পড়েছি। তবে ছেষট্টি বছরের ভারিক্কি সুনীলের সঙ্গে সেই দামাল ভবঘুরে নীলুকে ঠিক মেলাতে পারছিলাম না। বয়স, সাফল্য বোধহয় মানুষকে কিছুটা পালটে দেয়।

তাই আমার বাড়ির কাছের টিডবিনবিলার সংরক্ষিত অরণ্যে ওঁদেরকে নিয়ে যেতে কিছুটা অস্বস্তি ছিল। কিছুটা যেন ময়রার সামনে মিষ্টির থালা ধরা। সুনীলদা বলছিলেন অস্ট্রেলিয়াতে এসে ক্যাঙারুর মাংস খেয়েছেন, কিন্তু বন্য পরিবেশে দেখা হয়ে ওঠেনি। সেই কথা ভেবেই সিদ্ধান্ত নিলাম চট করে ঘুরিয়েই দেব।

সঙ্গে ছিলেন পূর্বোক্ত আবদুল চৌধুরী। ওঁর গাড়িতেই গিয়েছিলাম। সামনে চালক ও সুনীলদা, পিছনে স্বাতীদি ও আমি। ড্রাইভ না করতে হওয়ায় কিছুটা স্বচ্ছন্দে গল্প করছিলাম। অনেক গল্পের মধ্যে একটা মনে আছে। সুনীলদা বিদেশ ঘুরে কলকাতা ফিরছেন। সেই সময়ে ‘দেশ’ পত্রিকাতে ধারাবাহিক ভাবে ‘প্রথম আলো’ প্রকাশিত হচ্ছিল। কোন এক চরিত্রের আসন্ন মৃত্যুর ইঙ্গিত ছিল। দমদমে কাস্টম্স এর এক কর্মীর আবদার, সেই চরিত্রটিকে বাঁচিয়ে রাখার প্রতিশ্রুতি না দিলে ওঁকে ছাড়বেন না। জানতাম কাহিনীর কিছুটা অবিশ্বাস্য এক মোচড়ে চরিত্রটির মৃত্যু হয়নি। সুনীলদাকে তাই বলেছিলাম “কথা তো রেখেছিলেন”। শুনে হেসেছিলেন। কার যেন একটা লেখা পড়েছিলাম “সুনীল কথা রাখেনি” শিরোনামে। এক্ষেত্রে কিন্তু সুনীল সামান্য কাস্টম্স কর্মীটির কথা রেখেছিলেন !

টিডবিনবিলা আমাদের বাড়ি থেকে মোটামুটি চল্লিশ মিনিটের দূরত্ব। দশ মিনিটে লোকালয় ছাড়াবার পর অতি মনোরম দৃশ্য। দু পাশে উন্মুক্ত ঘাস জমি – অসংখ্য ভেড়া, গোরু চরে বেড়াচ্ছে। সংখ্যায় অত না হলেও প্রচুর সুন্দর চেহারার ঘোড়াও দেখা যাচ্ছে খামার বাড়ি গুলির ছড়ানো ছেটানো জমিতে। এই সংরক্ষিত অরণ্যে আমি কম করে ডজনখানেক অতিথিকে নিয়ে গেছি। ক্যানবেরার পর্যটকদের জন্য অন্যতম দর্শনীয় স্হান এটি। ৫৫ বর্গ কিমি আয়তনের পাহাড় ঘেরা এই উপত্যকাটির আকর্ষণ – অস্ট্রেলিয়ার বিদঘুটে জন্তুগুলির মধ্যে বেশ কয়েকটি এই সংরক্ষিত অরণ্যে ছাড়া

অবস্হায় দেখা যায়। বিভিন্ন আকারের ও রঙের নানা প্রজাতির ক্যাঙ্গারু ছাড়াও আছে ওমব্যাট, প্ল্যাটাপুস, কোয়ালা, এমু পাখি।

সাধারণত শয়ে শয়ে ক্যাঙ্গারু গাড়ি নিয়ে ঢুকতেই দেখা যায়। কিন্তু সেদিন মনে হয় বন্যপ্রাণীদের ধর্মঘট ছিল। আসলে শীতের দিনে চা জলখাবার খেয়ে বেরোতে দেরী হবার জন্যই বোধহয় এই বিপত্তি। সুর্য মধ্যগগনে, বন্যপ্রাণীদের বিশ্রামের সময় হয়তো।

আধ ঘন্টা ঘুরছি। একটাও ক্যাঙ্গারুর দেখা মেলেনি। চৌধুরী সাহেবের বাঙালের গোঁ ততক্ষণে চাড়া দিয়ে উঠেছে, পরিশীলিত বাঙলা ভাষাতে এসে গেছে সিলেটি টান "সুনীলদা আপনাকে ক্যাঙ্গারু দেখায়ে ছাড়ুম !" সুখের কথা, বাঙালের গোঁ শেষ পর্যন্ত সফল হয়েছিল। দেখা মিলেছিল এক দল লাল ক্যাঙ্গারুর। একটু ছোট আকৃতি এগুলির। কয়েকটি ছবি দিলাম। সুনীলদার সঙ্গে ছবিটির নাম দিয়েছিলেন চৌধুরী সাহেব – "কবি ও ক্যাঙ্গারু"। আমি নিশ্চিত এটি একটি অনন্য ছবি।

স্বাতীদি ছোট মেয়ের মত আনন্দে ছুটেছিলেন ক্যাঙ্গারুর পালের দিকে। অল্পক্ষণের জন্য চোখের আড়াল হয়ে গিয়েছিলেন। সুনীলদাকে বেশ ঘাবড়ে যেতে দেখেছিলাম। উদ্বিগ্ন মুখে একটু গলা চড়িয়ে "স্বাতী! স্বাতী" ডাকটি কানে বাজে।

নামী মানুষদের বা সেলিব্রিটিদের সম্বন্ধে কেচ্ছার অভাব হয় না। সুনীল গঙ্গোপ্যাধ্যায়ও এ হিসাবে ব্যতিক্রম ছিলেন না। জীবনে সুনীলদা ছাড়াও বেশ কয়েকজন আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বময় সফল পুরুষের সংস্পর্শে এসেছি। এঁদের চেহারায় আলাদা কোন বৈশিষ্ট নেই, কিন্তু বুদ্ধি এবং ব্যক্তিত্বের টান প্রায়শই মহিলারা এড়াতে পারেন না। সুনীলদার প্রয়ানের পর এক সাক্ষাৎকারে স্বাতীদি খোলাখুলিভাবেই বলেছিলেন সুনীলের জীবনে অন্য নারীরাও ছিলেন।

সে যাকগে। সেটা ওঁদের ব্যক্তিগত জীবনের ব্যাপার। আমার নাক গলাবার কোন প্রয়োজন বা অধিকার নেই এ বিষয়ে। শুধু একটা কথাই বলব, সেদিন টিনবিনবিলার প্রান্তরে সুনীলদার কণ্ঠে যে আর্তি ছিল জীবনসঙ্গিনীর প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা ব্যতীত তা আনা সম্ভব বলে আমার মনে হয় না।

(চলবে)

সিদ্ধার্থ দে – আই আই টি খড়গপুরের মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর স্নাতক। স্নাতোকত্তর পড়াশুনা আমেরিকার ইউনিভার্সিটি অফ নিউ হ্যাম্পশায়ারে। ১৯৯০ সাল থেকে পাকাপাকি ভাবে অস্ট্রেলিয়াতে। দীর্ঘদিন ক্যানবেরা নিবাসী। ২০১৫-তে কর্মজীবন শেষ করে আপাতত সাহিত্য চর্চা, ভ্রমণ, টুকটাক লেখালেখি নিয়ে আছি। আর হ্যাঁ – ফেসবুকে, ওয়াটস্অ্যাপে ইত্যাদি সামাজিক মাধ্যমে সারা পৃথিবীতে ছড়ানো বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডাও জীবনের একটা বড় অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে হালে। আমার মূলত ব্লগধর্মী কিছু লেখা desidd.wordpress.com সাইটটিতে সংকলিত করেছি।

বড়গল্প

স্নেহাশিস ভট্টাচার্য

অচেনা ঢেউয়ের শব্দ

পর্ব ৩

চোখ বন্ধ করে বসে আছে বোধিসত্ত্ব, একটার পর একটা ছবি পুরোনো দিনের বায়োস্কোপের মত সরে সরে যাচ্ছে। নিচে একটা গাড়ী থামার আওয়াজে চমক ভাঙলো ওর। বাইরে অন্ধকার। সন্ধ্যা নেমেছে। আকাশে মেঘ এখনো রয়েছে। বৃষ্টি নামবে হয়তো। ঘরের আলো জ্বালাতে ইচ্ছে করলো না ওর। ধীর পায়ে বারান্দায় এসে দেখলো, অরবিন্দবাবুরা সপরিবারে দাঁড়িয়ে। সঙ্গে মালপত্রও আছে। ওকে দেখে হাত নাড়লেন।

অরবিন্দবাবুরা স্বামী, স্ত্রী আর এক মেয়ে। মেয়ের বিয়ে হয়েছে পন্ডিচেরীতে। স্ত্রী সোমলতা কম কথার মানুষ। লাফিং ক্লাবের সদস্যা নন। এখনো সেলাই, উলবোনা, বড়ি দেওয়া, আচার তৈরী এইসব নিয়েই থাকেন। ওই মালপত্রের অনেকটাই মেয়ে জামাই আর নাতির জন্য ওনার বানানো খাবার সেটা নিশ্চিত। মেয়ের বাড়ী ? জিজ্ঞেস করলো বোধিসত্ত্ব।

হ্যাঁ, এবার একমাস। রামকৃষ্ণবাবুও এসে দাঁড়িয়েছেন। হ্যাঁ হ্যাঁ ঘুরে আসুন।

ওনারা বেরিয়ে গেলেন।

বোধিসত্ত্বর কোথাও যাওয়ার নেই। অফিসের কাজে দেশ বিদেশের বহু জায়গায় ও ঘুরেছে। কিন্তু ওর জন্য কেউ কোথাও বসে নেই। কেউ অপেক্ষা করে নেই।

সন্ধ্যের বাতাসটা ভারী আজ। অনেকটা জল জমে আছে। বাইরে একবার বেরোতে হবে। রাতের বরাদ্দ রুটি কিনতে। কিন্তু পাহাড়প্রমাণ আলস্য গ্রাস করেছে ওকে আজ। পতাকা নামিয়ে তারপর বেরিয়েছেন অরবিন্দবাবু। ফুলগুলো ভিজে মিশে গেছে। আবাসনের আলোগুলো জ্বলে উঠেছে একে একে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে চমকে উঠলো ও। একটু কোনাকুনি তাকালে দুটো দেবদারু গাছের মাঝখান দিয়ে সুজাতা মাসিমার ফ্ল্যাটটা দেখা যায়। কেউ দাঁড়িয়ে আছে ওখানে, গায়ে রঙীন পোশাক। হলুদ রঙের কুর্তি গলায় লাল ওড়নাটা প্যাঁচানো। একটু আনমনে যেন আকাশটাকেই জরিপ করছে। মুখ এত দূর থেকে বোঝা সম্ভব নয়। কিন্ত বোধিসত্ত্ব নিজেও জানে না যে ওর পাদুটো কেন আটকে আছে।

*   *   *   *

সবার না হলেও বেশীর ভাগ মন দেওয়া নেওয়ার পালায় বসন্ত কালের অপার মহিমা। বোধিসত্ত্ব আর যশোধারার ভালোবাসায় রং লাগাতে ঋতুরাজও হাজির হল। দোল পূর্ণিমায় কলেজ ছুটি থাকে। প্রতিবারের মতো এবারও আগের দিনই শুরু হয়ে গেলো রঙের উৎসব। বোধিসত্ত্ব প্রতিবার দূরেই থাকে এসব থেকে। এবার একটু ব্যতিক্রম।

সেদিন ক্লাস প্রায় হয়নি বললেই চলে। দুপুর গড়াতে শুরু হয়ে গেল রং নিয়ে হইচই। ক্লাস থেকে বেরিয়ে অভ্যাস বসেই হাঁটা লাগিয়েছিল ও। ল্যাব পেরিয়ে মাঠের পাশ দিয়ে বাগানঘেরা ছোট জায়গাটা পেরোলে একটু ঘুরেই গেট। ল্যাব পেরিয়ে ওই বাগানের কাছে আসতেই, এই যে কোথায় যাওয়া

হচ্ছে শুনি ? হলুদ চুড়িদার আর লাল ওড়নাটা কোমরে বাঁধা, হাতের সব লাল আবির ওর গালে গলায় মাথার চুলে লাগিয়ে গোটা শরীরে হাসির হিল্লোল তুলে দৌড়ে মাঠে চলে গেল যশোধারা। ওখানে সবাই তখন রং আর আবিরের রঙে নিজেদের রাঙাতে ব্যস্ত। যশোধারার খালি গলায় গান, আজ যানে কি জিদ মত করো.... লাল, সবুজ, হলুদ, আবির আর নাম না জানা রঙের ভিড়ে যেন রামধনু হয়ে রং ছড়াতে লাগলো। বোধিসত্ত্ব এই প্রথম কোথাও নিজের অতি প্রিয় কবিতাটা বলে উঠলো ওই গানের পরপরই,

হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে,

সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের

অন্ধকারে মালয় সাগরে

অনেক ঘুরেছি আমি, বিম্বিসার অশোকের

ধূসর জগতে

সেখানে ছিলাম আমি, আরো দূর

অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে,

আমি ক্লান্ত প্রাণ এক,

চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন,

আমারে দু দন্ড শান্তি দিয়েছিল......

সবাই মোহিত, বোধিসত্ত্ব তখন বনলতা সেনে বিভোর। দুজন ভালোবাসার মানুষ উজাড় করে দিচ্ছে নিজেদের একে অপরের কাছে। রং তার আপন খেয়ালে সৃষ্টি করে চলেছে নতুনের আলপনা। রঙে ভিজে চলেছে সবাই। কেউ আড়াল খুঁজছে। ওরা দৃষ্টি বিনিময়ে ব্যস্ত। এত ভীড়েও ওরা আলাদা, কখন যেন খুব কাছে এসে দাঁড়িয়েছে যশোধারা। গান আর নাচে, রং আর ফাগে যেন পলাশও ফিকে। সেদিন যশোধারাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বলেছিল ভালোবাসা কী সে তো জানি না। কিন্ত তোমার জন্য মন কেমন করে খুব। কান্না পায় খুব। যশোধারা উত্তর পেয়ে গেছিল। আজ ও এতো কাছে যে ওর কাঁপতে থাকা সিক্ত শরীরের উত্তাপ আর হৃদস্পন্দন শুনতে পাচ্ছে বোধিসত্ত্ব। ওর হাতটা ধরে বললো ভালবাসার দিব্যি ভালোবাসি।।। রং এর আগুন ম্লান হয়ে গেলো যশোধারার হাসির ঝিলিকে, দৌড়োচ্ছে যশোধারা, গেট পেরিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ীর দিকে.... বোধিসত্ত্ব চোখ ফেরায়নি এক মুহূর্তও।

প্রচন্ড জোরে বজ্রপাতের শব্দ, চমকে উঠলো বোধিসত্ত্ব, বাইরে তাকিয়ে দেখল দিগন্ত যেন রং খেলেছে, লাল হয়ে গেছে আকাশ আর তারই মধ্যে বিদ্যুতের ঝলক, মনে পড়ে গেলো বিদ্যুৎ..... দামিনী.....

আজকের রাতটা বড্ড দীর্ঘ। সত্যি বলতে কি নিজেকে এত আনমনা বহুদিন বোধিসত্ত্বর মনে হয় নি। একটা নিখুঁত রোজনামচায় মোড়া জীবনটা যেন আজ কোনো কথাই শুনতে রাজী নয়। বাইরে বৃষ্টিরও বিরাম নেই। কখনো থামলেও যেন ভুল হয়ে গেছে ভেবে আবার শুরু হওয়া। রুটি আনতে বেরোয়নি ও আজ। ফ্রিজে দুদিন আগের একটা ব্রাউন ব্রেড বের করে দুপুরে অবশিষ্ট চিকেন দিয়েই নৈশভোজ শেষ করলো। বাইরে তাকিয়ে দেখলো আকাশটা ঘন হয়ে রয়েছে। বৃষ্টি তার দাপট সামান্য হলেও কমিয়েছে।

বাইরের বারান্দায় আসতেই চাপা গলার আওয়াজ বলে মনে হলো। বৃষ্টির আওয়াজ সঙ্গে একটানা কোনো পোকার আওয়াজে বাকি শব্দগুলো ঠিক স্পষ্ট নয়। বাইরে যে রাস্তা ধরে জগিং করে সেই রাস্তা বরাবর আলোগুলো জ্বলছে, কিন্ত বৃষ্টির দাপটে সেগুলোর উজ্জ্বলতায় ভাঁটা পড়েছে। তবু একটু মন দিয়েই শোনার চেষ্টা করলো। ঘড়িতে এখন এগারোটার

কাঁটা পেরিয়ে গেছে। কিছুই আর দৃষ্টিগোচর বা কর্ণগোচর হলো না। প্রায় সব বাড়ীরই আলো বন্ধ। একটা সিগারেট ধরাতে হবে, ভিতরে এসে লাইটারটা নিয়ে বারান্দায় আসতেই চোখে পড়লো ছাতা মাথায় কেউ খানিকটা সামনে বেশ তাড়াতাড়ি হাঁটছে, বোধিসত্ত্ব হাঁক পাড়লো কে ? ছাতা মাথায় ভদ্রলোক ঘুরে তাকালেন, আজ এক পরিচিতার জন্য রক্ত জোগাড় করার ছিল, কিন্ত কিছুই করা গেল না, এই শশ্মান থেকে ফিরছি, তারপর যা দুর্যোগ.... মাধববাবু। লোকের জন্য উনি সদাই করেন। বোধিসত্ত্ব বলল, যান আগে নিজে ফ্রেশ হয়ে কিছু খান। মাধববাবু চলে গেলেন। চোখে একটা আলো এসে লাগলো, সুজাতা মাসিমার ফ্ল্যাটের আলোটা জ্বলে উঠলো। একটু আনমনেই ঘরে এলো বোধিসত্ত্ব। ঘরের হালকা নীল আলো জ্বলছে। সেদিকে তাকিয়ে রইলো একদৃষ্টে। একটা নীলচে স্বপ্ন ধীরে ধীরে গ্রাস করতে লাগলো ওকে।

সেইদিন রঙের উৎসব শেষে বাড়ী ফিরে অনেকক্ষণ বুঁদ হয়ে ছিল বোধিসত্ত্ব। ভালোবাসা অপেক্ষা বেশী আসক্তি আর কোনো নেশাতেই নেই।

আমি কিনবো ফুল, তুমি ঘর সাজাবে যাবজ্জীবন... জয় গোস্বামীর 'পাগলী তোমার সঙ্গে'। অনেক দিন পরে আবার পড়ছে ও। জীবনটা নতুন ভাবে আঁকছে চোখের পাতায়। আসতে আসতে সময় চলে যাচ্ছে। এটাই শেষ বছর। কিভাবে যে তিনটে বছর কেটে যেতে চললো। একদিন হঠাৎ-ই কলেজ ছুটির পর যশোধারা খুব খুশী হয়ে বলল, জানো আজ কলেজের গেটে কার সাথে দেখা হয়েছে ? এক চোখ জিজ্ঞাসা নিয়ে বোধিসত্ত্ব দাঁড়িয়ে রইল। আমরা তখন এই মুখার্জীপাড়ায় আসিনি। জাঙ্গিপুরে থাকতাম। দাদুঠাকুমাও বেঁচে তখন। আমি তখন ক্লাস নাইন। ছোটবেলা থেকেই গান শিখি। বাবা পন্ডিতজির কাছে নিয়ে এসেছেন আরো ভালো তালিমের জন্য। আসলে মা খুব ভালো গান গাইলেও বাবা নিজেও গান পাগল লোক। ওরা আস্তে আস্তে হাঁটছে ওদের চেনা পথ ধরে। বোধিসত্ত্ব শুনছে ওর কথা। এত খুশী দেখাচ্ছে আজ ওর যশোধারাকে যে ও নিজেও বেশ খুশী, আবার বেশ অবাকও। যশোধারা বলেই চলেছে, ঐখানে একটি ছেলেও তালিম নিতো। অপূর্ব গলা। জানো আমার জীবনের প্রথম পুরুষ বন্ধু। খুব সহজ ছিলো ও। ওর ভালো লাগার গানের ক্যাসেট করে দিয়ে যেতো আমার সব জন্মদিনে। আমিও খুব প্রাণখোলা ছিলাম ওর কাছে। বোধিসত্ত্ব একটা সিগারেট ধরালো। অন্যদিনের মত বাধা দিল না যশোধারা। তারপর একদিন হঠাৎ করেই বাবা বললেন এখানে চলে আসার কথা। ততদিনে দাদু আর ঠাকুমা দুজনেই মারা গেছেন। সেই দিনটায় শেষ দেখা, একটা অদ্ভুত কথা বলেছিল ও, বলেছিল তোমরা চলে যাচ্ছ ? আমার গানটাও যে শেষ হয়ে যাবে। আমি কিছু বুঝি নি। কিন্ত যেদিন চলে এলাম সেইদিন বুঝতে পেরেছিলাম, আমি ওকে ভালোবাসতাম। বোধিসত্ত্ব আরও একটা সিগারেট ধরিয়েছে। আজ হঠাৎ দেখা। একটু কথাও হলো। বেশ মজা লেগেছে কিন্তু। বোধিসত্ত্ব শান্ত গলায় বলল, ভালো লেগেছে বলো। ওরা গাড়ীর কাছে পৌঁছে গেছিল। সারা রাত ঘুম আসেনি বোধিসত্ত্বর। প্রেম বড়ো জ্বালা। ছেলেটার নামও জিজ্ঞেস করা হয় নি। পরের দিন কলেজ গেল না বোধিসত্ত্ব। পরের দিনও না। বিকেলে সঞ্জয় এসে হাজির। কি ব্যাপার গুরু, দুদিন কলেজ এলে না? দুজনে প্ল্যান করে ডুব ? বোধিসত্ত্ব বুঝতে পারলো যশোধারাও এই দুদিন আসেনি কলেজে। ছটফটানিটা বাড়লো, কিন্ত মুখে প্রকাশ করল না। যশোধারার খোঁজ আর নেবে না ও। একটা একটা করে ক্লান্ত দিন আর নির্ঘুম রাত বোধিসত্ত্বকে কুরে কুরে খেয়ে ফেলছিল। আজ এক মাস যশোধারার সাথে যোগাযোগ নেই। কলেজ নাকি এসেছিল দু দিন। বোধিসত্ত্বের সুপ্ত ইগো ওকে এগোতে দেয় নি। একদিন হঠাৎ করেই শুনলো যশোধারারা চলে যাবে কলকাতা এখানের অধ্যায় শেষ করে। পরেরদিন ভোরবেলা বোধিসত্ত্ব গিয়ে দাঁড়ালো মুখার্জীপাড়ায়। হাতে

একটা খাতা। যশোধারা জগিং থেকে ফিরছে, ওকে দেখে থমকে গেলো। তোমরা নাকি চলে যাচ্ছ? মুখটা একটু নামিয়ে উত্তর দিলো ও, হ্যাঁ, বাবার সিদ্ধান্ত। –কবে ?– আগামী কাল। – কালই? –হুঁ। আমায় ভুলে যেও। ঈষৎ হেসে বোধিসত্ত্ব বললো তোমায় কিছু দিতে চাই। এক চোখ প্রশ্ন নিয়ে দাঁড়িয়ে যশোধারা। বোধিসত্ত্ব একটা খাতা বাড়িয়ে ধরলো ওর দিকে। হঠাৎই সত্যপ্রিয় বাবুর গাড়িটাকে দেখা গেলো, যশোধারা তাড়াতাড়ি খাতাটা নিয়ে চলে গেলো। বোধিসত্ত্ব ক্ষণিকের জন্য দাঁড়িয়ে দৌড় শুরু করলো, নতুনভাবে।

দেওয়াল জুড়ে স্বপ্ন আঁকতে চেয়েছিলো কিন্তু পাহাড়ের গা বেয়ে ঝর্ণা হতে চায়নি। পাহাড়ী খরস্রোতা নদী হয়ে বয়ে গেছিল। পাহাড়ের প্রতিটা বাঁক ওকে চেনে। আর প্রতিটা বাঁকে ভালোবাসা বুনতে বুনতে কখন যে ওই বাঁকেই হারিয়ে গেলো প্রেম বুঝতেই পারা গেলো না। সমস্ত শরীর জুড়ে বুনো শরীরী গন্ধ। ধ্বস নামা পথে সারা শরীরে নখের আঁচড় ভালোবাসার চিহ্ন বহন করে। বয়ে চলা পথে নিত্য রক্তক্ষরণ। কথা রাখেনি কেউ। দূরের কোনো স্মৃতিজ্বলা রাতের আকাশে মিটমিট করে দগ্ধ প্রেমের উপাখ্যান। আর শীতল ভালোবাসার জলে ডিঙি নৌকা ভেসে চলে উপসংহারের খোঁজে। এক বসন্ত প্রেম এসেছিল নদীর দুকূল ছাপিয়ে। এক পাহাড় মৌনতার শব্দে কখন যেন এলোমেলো হয়ে যায় সব। পাহাড়ের বুকে ঝর্ণা এঁকে নয় পাহাড়ের সমস্ত মৌনতা ভঙ্গকারী এক নীরব প্রতিশ্রুতি হয়ে ভালোবাসা থেকে যায় প্রেমের গল্পে কবিতা হয়ে।

বোধিসত্ত্ব ঘুমাচ্ছে। ওর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। একটা আর্ত চিৎকারে চমকে উঠে বসলো ও।

ফরেনসিক রিপোর্টটা হাতে নিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে বোধিসত্ত্ব। পুরো ঘটনাটা সব বিশ্বাসের বাইরে। আরও একবার চোখ বোলালো, the death was due to asphyxia as a result of constriction of neck as a consequence of hanging or strangulation. নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছেনা ও।

সেইদিন রাতের ওই আর্তনাদ শুনে দৌড়ে প্রথমে বারান্দায় এসেছিল, সবার আগে রামকৃষ্ণবাবুকে দৌড়তে দেখলো পিছনেই গিরিশবাবু, কিন্তু যাচ্ছে কোথায় ? সাত পাঁচ না ভেবে হাতের সামনে রাখা টি শার্ট আর ট্র্যাকপ্যান্ট গলিয়ে বোধিসত্ত্বও দৌড়ে বেরোলো। ইতিমধ্যে আবাসনের প্রায় সকলেই বাইরে বেরিয়ে পড়েছে। বোধিসত্ত্ব বুঝলো যা ঘটেছে সুজাতা মাসিমার ফ্ল্যাটেই। দ্রুত পায়ে উঠে এলো সুজাতা মাসিমার ঘরে। আর তারপর যা দেখলো তাতে বোধিসত্ত্ব স্থবির হয়ে পড়লো। ঠিক ওই মুহূর্তে ওর মনে হচ্ছিলো সমস্ত চরাচর অন্ধকার, ও একলা আর একটা অপার্থিব আলো ওকে বেষ্টন করে চলেছে, যেন নাগপাশ। হাত পা কোনো কিছু নাড়ানোর ক্ষমতা লোপ পেয়েছে ওর। গলার কাছে গিয়ে সব শব্দ আটকে গেছে। বিস্ময়, বিহ্বলতা, কষ্ট সব মিলেমিশে একাকার হয়ে ওকে স্থানুবৎ করে রেখেছে। আশুতোষবাবু আস্তে আস্তে এগিয়ে এলেন, বললেন সুজাতাদির ভাইঝি, দুদিন হলো হিমাচল থেকে এসেছে। কিছুদিন থাকার কথা ছিলো। কিন্তু কি যে হয়ে গেলো! সুজাতামাসিমা একটা চেয়ার ধরে দাঁড়িয়ে। বিষ্ণুপ্রিয়াবৌদি ঘরে ঢুকেই বেরিয়ে গেছেন। রাধাবৌদি আর রুক্মিনী সুজাতামাসিমাকে সামলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। রামকৃষ্ণবাবু বললেন পুলিসে খবর দিতে হবে তো। কিন্তু এইসব কাজে যিনি সবার আগে সেই মাধববাবু কোথায় ? রাধাবৌদিও একটু অবাক, আমার সাথেই তো এলো। সেই সময়ই মাধববাবুর প্রবেশ। এসেই জিজ্ঞেস করলো কোনো সুইসাইড নোট পাওয়া গেছে কি ? এতক্ষণে সবার টনক নড়ল। সেরকম কিছু নেই, বিছানা জুড়ে কিছু ক্যাসেট। মাধববাবু খুব ধীরে ধীরে সেগুলো গোছাতে লাগলেন। এক কোণে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকা গিরিশবাবু একটু জোরেই বলে উঠলেন, 'পুলিস এলেই না হয় ওগুলোতে হাত দেওয়া হবে'। মাধববাবুর ধীর গলায় উত্তর, 'এগুলো কোনো এভিডেন্স হতে পারে না'।

গিরিশ বাবু বললেন, তুমি কি পুলিস না ডিটেকটিভ হে। রামকৃষ্ণবাবু সব ঘোর কাটিয়ে জিজ্ঞেস করলেন পুলিসে ফোন কে করলো ? মাধব বাবু বললেন আমি।

বোধিসত্ত্ব এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে লাল ওড়নায় ঝুলন্ত দেহটির দিকে। চোখ দুটি বিস্ফারিত। বিজ্ঞান বলে প্রায় যন্ত্রণাহীন মৃত্যু। কিন্তু বোধিসত্ত্ব নিজের সাথে লড়াই করতে পারছে না আর।

কিরকম সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। ইন্সপেক্টর রণজয় সরকার ঘরে ঢুকলেন, সাথে ফটোগ্রাফার। আরো একজন ভদ্রলোক সাথে দাঁড়িয়ে খুব মন দিয়ে জরিপ করছে মৃতদেহটিকে। ইন্সপেক্টর এসেই ঘরের মিউজিক সিস্টেম এর কাছে এসে হাত দিয়ে কিছু একটা দেখলেন। চালু করে দিলেন সেটি, এটা একটা বহু পুরোনো মেটাব্লিজ কোম্পানীর টেপরেকর্ডার। অন হতেই একটা গান, জগজিৎ সিং এর কিন্তু গলাটা অন্য কারো।

ইন্সপেক্টর নির্দেশ দিলেন, “লাশ নামাও।” বোধিসত্ত্বর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলো,

– ওর নাম যশোধারা। গোটা ঘর জুড়ে নেমে এলো এক অবাক নিঃস্তব্ধতা ।

(চলবে)

স্নেহাশিস ভট্টাচার্য – কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য সম্প্রচার দপ্তরের কর্মী। বর্তমানে কলকাতা দূরদর্শন ভবনে কর্মরত। বহুদিন থেকেই চলে আসছে সাহিত্যের নিবিষ্ট পাঠ এবং নিভৃত চর্চা। পেশাগত ও পারিবারিক ব্যস্ততায় যখন হারিয়ে যেতে বসেছিল তাঁর এই সৃষ্টিশীলতার ধারা, সে সময় এক বুধ সকালে আকাশবাণী মৈত্রীতে তাঁর নিজের লেখা পড়তে শোনা (এবং তারপর থেকে প্রায় নিয়মিত সেরার বাছাই এর তালিকায়), তাঁর সাহিত্যচর্চায় নতুন উৎসাহের সঞ্চার করে। সেই থেকেই চলে আসছে জীবনের জলরঙে স্বপ্ন বোনার কাজ, কখনো ছন্দে, কখনো বা গদ্যে . . .

~~~~~~

বাতায়ন বুলেটিন

শিকাগোতে প্রাক পূজার মেলায় সম্পাদিকা রঞ্জিতার সাথে স্বর্ভানু সান্যাল

সিডনিতে বিশেষ বন্ধু ও Missing Link-এর কর্ণধার ইন্দ্রনীল হালদারের সাথে টিম বাতায়ন

জলপাইগুড়ির “তিস্তা কন্যা” পত্রিকার সম্পাদিকা ও লেখিকা রুবাইয়া জেসমিন (জুঁই) বাতায়নে

পত্রভারতী পাবলিকেশনের কর্ণধার চুমকি চট্টোপাধ্যায় বাতায়নে
~~~~~~

দেবীপ্রিয়া রায়

একদিন যারা

পর্ব ৩

আলোকের এই ঝরনাধারায় ধুইয়ে দাও

আচ্ছা, ঐ যে দুই বছর আগে সেদিন সে জর্ডান নদীর ধারে সেই নিরালা জঙ্গলে গিয়েছিল, তা যদি না যেত, তাহলে আজ তার জীবনটা কি অন্য ধারায় বইত ? কেন যে গিয়েছিল, সেটা সেদিন তার নিজের কাছেই স্পষ্ট ছিল না । এখন অবশ্য ভেবে মনে হয় যে কিছুটা কৌতূহলেই তার সেদিন সেখানে যাওয়া । তার মাসতুতো ভাই জন ও সেই সময় পুরোহিত তন্ত্রের কান্ডকারখানার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল । মানুষের ক্ষুদ্রতা, দুর্বলতা মুছে নিতে ঈশ্বর স্বয়ং জন্ম নিতে চলেছেন, এই ছিল জনের বিশ্বাস । যীশুর কানে এসেছিল যে জন্ ঈশ্বরের দূতকে স্বাগত জানানোর জন্য সব ইহুদীকে পাপ ধুয়ে শুদ্ধ হওয়ার ডাক দিয়েছে আর তার সাথে এও বলেছে যে পুরুতদের মূল্য ধরে দিয়ে মিক্‌ভা কুন্ডে ডুব দেওয়ার আর দরকার পড়বে না; জর্ডান নদীর জলে অবগাহন স্নানেই সব পাপ ধুয়ে যাবে । ঠিক কি জন্ করতে চায় জানার ইচ্ছায় যীশু সেখানে না গিয়ে পারেনি । তার জানা ছিলনা যে জন তাকে দেখে সেদিন ভাই বলে না ডেকে ‘প্রভু’ বলে ডেকে উঠবে, আর বলবে যে সে স্বয়ং ঈশ্বরের প্রতিভূ, তার শুদ্ধীকরণের কোন প্রয়োজন নেই ।

কথাটা অবশ্য সে সেদিন মেনে নিতে পারেনি; সেইজন্যই জনের কথা না শুনে অন্যদের অনুসরণ করে সেও জলে নেমে গিয়েছিল । কিন্তু জল থেকে যখন সে উঠে এল, তখন যেন তার এক নতুন জন্ম হয়েছে । বিজন বনের ধারে, নদীর ঠান্ডা জলে ধুয়ে যাওয়া শরীরের ওপর হাল্কা হাওয়ার পরশ, খোলা আকাশে উড়ে যাওয়া পাখীদের আনন্দের ডাক, মেঘমুক্ত নীল আকাশে তরুণ সূর্যের আলো যেন তার মন আর শরীরের ওপর থেকে সমস্ত ক্লেদের আবরণ ঘুচিয়ে দিয়ে তাকে নিখিল বিশ্বের সাথে এক করে দিয়েছিল । তার মনে হয়েছিল সে এক জ্যোতির্ময় সত্ত্বা — নিখিল বিশ্বের জ্যোতির একটি বিচ্ছুরণ — তার যে কোনো ইচ্ছায় সে এই বিশ্বে তরঙ্গ তুলতে পারে । নিজেকে বুঝে নিতে সে সেদিন সকলের থেকে দূরে একা চলে গিয়েছিল মরুভূমির মাঝে । চল্লিশ দিন ধরে নিজের সাথে একা ছিল সে । একা একা নিজেকে জিজ্ঞাসা করেছিল এর পর তার কর্ত্তব্য কি । সে কি নিজের এই জ্যোতি, এই শক্তিকে ব্যবহার করে লোক লস্কর, টাকাকড়ি ক্ষমতা অর্জন করবে, নাকি এই আলোকময় আনন্দকে অন্যের মাঝে বিলিয়ে দেবে । চল্লিশ দিন পরে যখন সে ফিরে আসে, তখন সে ক্লান্ত আর ক্ষুধার্ত কিন্তু আর তার মনে নিজের পথের সম্বন্ধে কোন দ্বিধা নেই । সে বুঝতে পেরেছে যে সকলের মনের আগল খুলে দিয়ে আলোর সন্ধান দেওয়াই তার একমাত্র পথ, আর ঠিক সেদিন থেকেই সে জানে যে, তাকে অসীম বিপদ মাথায় করে একলা পথ হাঁটতে হবে । খাঁচার পাখীর দোর খুলে দিলেও সে যেমন উড়তে চায় না, ছোট ছোট স্বার্থের গণ্ডীর মধ্যেই যারা নিজেদের সার্থকতা খোঁজে, এই বাঁধনহারা অসীম বিস্তারের সন্ধান পেলেও তারা সেই অসীমে ডানা মেলবে না । উল্টে তারা তাকে আঘাত করবে, নিজেদের পথ হতে তাকে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করবে । যীশু জানে একথা, জেনেই সে আজ জেরুসালেমে এসেছে । জেরুসালেমে এবার তার চূড়ান্ত পরীক্ষা ।

এই পরীক্ষার দিনটির জন্য সে অনেকদিন ধরে প্রস্তুতি করেছে । গত দুই বছরে গোটা গ্যালিলি উপত্যকা পায়ে হেঁটে ঘুরে ঘুরে সে সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলেছে । সমাজের গন্যমান্যদের কাছে সে যায়নি, তার শ্রোতা ছিল খেটে খাওয়া মানুষজন — চাষা, জেলে, মুটে মজুর, ফেরিওয়ালা । তাদের সে বলেছে, ‘‘আমাদের গড়েছেন যে রাজাধিরাজ বিশ্বপিতা, তিনি আছেন তাঁর ঘরে আমাদের অপেক্ষায় । কি হবে এই ধূলি মাটির কেনান রাজ্যকে নিয়ে মাথা ঘামিয়ে ? আমাদের ফিরে যেতে হবে পিতার রাজধানীতে — আচার অনুষ্ঠান নিয়ম নিষ্ঠা পালন করে সেখানে যাওয়া যায়না, তার পথ আছে ভালবাসার মাঝে । যেদিন পিতার হাতে গড়া এই বিশ্বের প্রতিটি মানুষকে তুমি ঠিক তোমার নিজের মত ভালবাসতে পারবে, সেই দিন তিনি দুই হাত বাড়িয়ে তোমায় কাছে টেনে নেবেন ।’’

তুমি এবার আমায় লহো হে নাথ লহো

শ'য়ে শ'য়ে বছর ধরে গড়ে তোলা এইসব নীতিনিয়ম ভাঙার ডাক দিয়েছে বলে শুধু পুরোহিতরাই নয়, সমাজপতিরাও আজ যীশুর উপর ক্রুদ্ধ, কিন্তু তার শ্রোতারা তাকে ভালোবেসেছে, তার ডাকে সাড়া দিয়েছে। তবু তারাও তো ঘর সংসারী সাধারণ মানুষ, ছোট ছোট দুঃখ সুখের ধারায় তাদের জীবন বাঁধা। শাসক আর সমাজপতিদের রক্তচক্ষু আর অত্যাচারকে তারা বড় ভয় পায়। যীশু কতবার তাদের বোঝাতে চেষ্টা করেছে যে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে যে অত্যাচার সহ্য করে, সেই পরমপিতার আশীর্বাদ পায়, তবু তাদের ভয় যায়না। যীশু যে তাদের অবস্থা বোঝেনা তা নয় – প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে দেহমনের উপর ক্ষমতাসীনেরা যে অত্যাচার করবে সেটা সইতে ক'জন পারে, বিশেষ করে যাদের ছেলেপুলে নিয়ে দরিদ্রের সংসার। এদের পথ দেখাতে হলে নিজেকে প্রথম সেই পথে হেঁটে দেখাতে হবে। হাসিমুখে অত্যাচার সহ্য করা – কাজটা কঠিন ! এ কাজ সে নিজে ছাড়া আর কেই বা করতে পারে ? এবার জেরুসালেমে সে এই উদ্দেশ্য নিয়েই এসেছে।

সে জানে এইখানেই তার জীবনের শেষ – ক্ষমতালোভীদের বিরুদ্ধে মাথা তুললে তারা এখান হতে তাকে প্রাণ নিয়ে ফিরতে দেবে না – ফিরতে সে চায়ও না। নির্ভীক ভাবে প্রাণ দিয়ে সে এদের ভয় চিরকালের মতন ঘুচিয়ে দিয়ে যেতে চায়। কি হবে পশুবলিতে, কি হবে মিকভা কুন্ডের স্নানে ? তার আত্মবলিতে, তার রক্তের ধারায় যেন মানুষ চিরকালের মতন ভয়ের ক্লেদ মুছে ফেলে নির্মল হতে পারে। আজ দুপুরে মন্দিরের আঙিনায় তাই সে সবার সামনে দেবতার নামে ব্যবসার বিপক্ষে রুখে দাঁড়িয়েছিল – এবার হয়তো তার উপর আঘাত আসবে। সে আঘাত কোনদিক হতে যে আসবে, পুজারীদের দিক হতে না রোমান শাসকদের – তা সে জানেনা, কিন্তু আতাতায়ীর দল যে আসছে, সে বিষয়ে সে সুনিশ্চিত !

কিন্তু আর কতক্ষণ ? কতক্ষণ তাকে তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে ? পেসাখের উৎসবে ব্যস্ত পূজারীরা কি তার দিকে মন দেওয়ার সময় পাবে ? বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হলে তার মনের জোর যদি কমে যায় ? অলৌকিক জন্মবৃত্তান্ত সত্ত্বেও সে তো রক্তমাংসের দেহধারী মানুষ – আঘাতে সে যন্ত্রণা পায়, আসন্ন সেই যন্ত্রণার ভয়ে যদি তার সংকল্প দূর্বল হয়ে পড়ে ? তা তো সে চায়না। তাছাড়া পেসাখ উৎসবে এই যে লক্ষ লক্ষ লোকের জমায়েত, এদের সামনেই সে বোঝাপড়া শুরু করতে চায়। একমাত্র তাহলেই ঘরফেরা লোকের মুখেমুখে তার প্রতিবাদের কাহিনী গ্যালিলির দূরে দূরান্তরে ছড়িয়ে গিয়ে সব্বাইয়ের মনে বল ভরসা জোগাবে।

পেসাখের সেই শেষ ভোজ

এক এক করে দুটি দিন কেটে গেল – আজ পেসাখের শেষ রাত্রি – ঘরে ঘরে বিরাট ভোজের আয়োজন। কাল সকলের ঘরে ফেরার পালা। যীশুর মন বলছে আজই ঘাতকেরা আসবে। উৎসব শেষ হয়েছে – কালকে ভিড় কমতে আরম্ভ করবে, পূজারিদের ব্যস্ততাও শেষ। এখান থেকে যাতে সে প্রাণ নিয়ে না ফিরে যেতে পারে, এবার সেই চেষ্টা শুরু হবে, হয়তো বা আজ রাত্রেই। ভোজের আয়োজন মাঝে রেখে চারপাশে ঘিরে বসেছে তার অনুচরেরা, তাদের দিকে দেখল সে – মমতায় গলে গেলো তার মন ! কাল যখণ ধরপাকড় শুরু হবে, তখন তার অনুচর হিসাবে এদের উপরে কি কঠিন শাস্তিই না নেমে আসবে, কিন্তু বল ভরসা জোগানোর জন্য সে নিজে এদের মাঝে থাকবে না। ছা-পোষা মানুষ এইসব লোকগুলি কি করে সহ্য করবে এই অত্যাচার ? কি করে এদের মনে সাহস জোগানো যায়, ভাবতে ভাবতে একটি জলে ভরা পাত্র হাতে তুলে নিলো সে; তারপর নীচু হয়ে বসলো অনুচরদের পায়ের কাছে। এই কয়দিন প্রচুর ঘোরাঘুরি গেছে। কাদামাটিতে গেঁও লোক কয়টির ফাটা ফাটা গোড়ালি ভরে গেছে, হাঁটুর কাছ পর্যন্ত শুকনো মাটি লেগে আছে। যীশু পরম আদরে ঘষে ঘষে তাদের পায়ের কাদা ধুয়ে দিতে লাগল, তারপর কোমরে জড়ানো গামছা খুলে শুকিয়ে দিল পায়ে লেগে থাকা জল। কয়েক মুহূর্ত সকলে হতবাক, তারপর হাঁ হাঁ করে উঠলো সবাই, বিশেষ করে সাইমন পিটার নামের জেলেটি। 'আরে ছিঃ ছিঃ এ কি করছেন কর্ত্তা ? পা তো আমাদের আপনাকে ধোয়ানোর কথা !' মুচকি হাসল একটু যীশু, তারপর যেমন ধুয়ে দিচ্ছিল তেমনি ধুয়ে দিতে দিতে বল্ল, 'তোমরা এই পৃথিবীর অন্য সকলের পা ধুইয়ে দিও, সেটাই তো আমার পা ধোয়া হবে।' কথাটার

তাৎপর্য কেউ বুঝল না, তাই বাধা না দিয়ে অস্বস্তি ভরে চুপ করে চেয়ে রইল। হাত ধুয়ে নিজের জায়গায় এসে বসল সে, ঠিক সেই সময় ঘরে ঢুকল একটি মেয়ে — ভরা যৌবন তার উছলে উঠছে, কিন্তু মুখখানিতে কেমন একটি তদ্‌গত ভাব — ভারি নিষ্পাপ মুখ! যীশুর পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো সে, তারপর নম্রসুরে বল্লো, ‘কর্ত্তা, পেসাখের ভোজের আগে সকলকেই তো ধোয়া মোছা করতে হয়, আপনার পা দুটি আমি ধুয়ে দিই।’ এতক্ষণে যীশু বুঝি একটু সঙ্কুচিত হয়ে উঠলো। মেয়েটির নাম মেরী — সে একজন প্রাক্তন বারবিলাসিনী। সে এখানে তার পা ধুইয়ে দিলে, তা নিয়ে ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হতে পারে। যীশু নিজে ঠিকই বোঝে যে মেয়েটির মন সম্পূর্ণ নিষ্পাপ — সে মনে তার প্রতি কেবল ভক্তি ছাড়া কিছুই নেই। তাকে যারা ঈশ্বরের অবতার ভাবে, এই মেয়েটি তাদের মাঝে একজন। তাছাড়া, যীশু নিজে মেয়েদের ব্যাপারে কোন আসক্তি বোধ করে না। তাদের দিকে তাকালে সে সেই পরম জ্যোতি বিচ্ছুরিত হতে দেখে, যে জ্যোতি এই সকল সৃষ্টির মূলে। তার মনে সবার জন্য গভীর ভালোবাসা — তাতে নারী পুরুষের ভেদ নেই। কিন্তু সকলকে সে কথা বোঝানো সম্ভব নয়। মেরী জলের পাত্রটি নিয়ে সযত্নে যীশুর পা ধুইয়ে দিল, যীশু তাকে বাধা দিতে পারলোনা। কিন্তু তারপরই মেরী এক কান্ড করে বসলো। পা ধোয়ানো শেষ করে সে নুয়ে পড়ে নিজের ঘন চুলের রাশি দিয়ে মুছিয়ে দিল তার পা। বিব্রত যীশু মুখ তুলে তাকিয়ে দেখলো সকলেই একটু অবাক হয়ে তাকিয়ে রয়েছে, যদিও তাদের কারুর মুখে বিরক্তির ছাপ নেই। ব্যতিক্রম একমাত্র জুডাস ইস্‌ক্যারিয়াটের মুখ — সে মুখে বিরক্তিতে বিতৃষ্ণায় কালো হয়ে গিয়েছে।

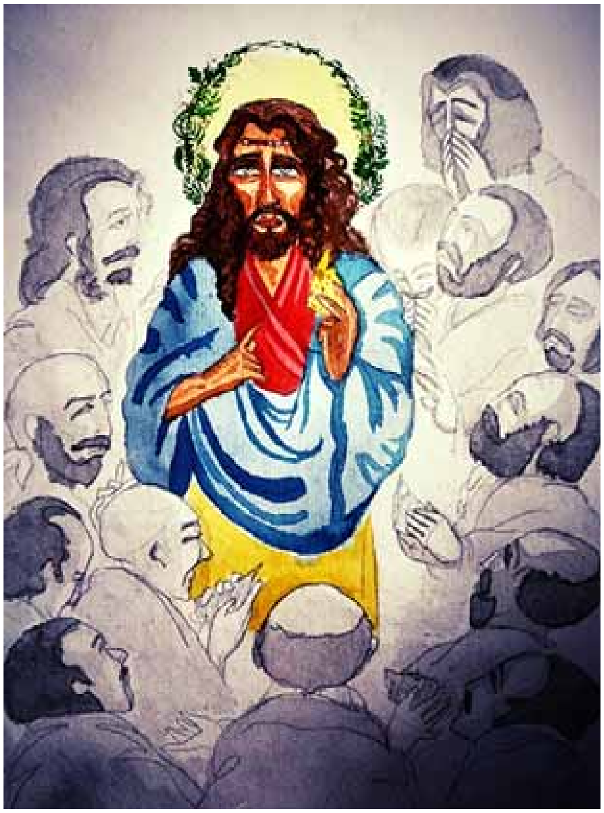

বিশ্বপিতা তুমি হে প্রভু

যীশু জানে যে যদিও জুডাস তাকে অনুসরণ করেই ঘর ছেড়ে চলে এসেছে, কিন্তু মানুষকে এই দেবতা বানিয়ে তোলা তাকে ক্ষুব্ধ করছে। যীশু যে এই ধরণের কাজে প্রতিবাদ জানায় না, তাতে জুডাস তাকে ভন্ড আর জোচ্চোর বলে মনে করে। এই মুহূর্তে তার ঠোঁটের কোণে বিদ্রুপের হাসিটি আরও বাঁকা হয়ে উঠেছে। সেইদিকে তাকিয়ে হঠাৎ যীশুর মনের মধ্যে একটা কথা ঝলসে উঠল, জুডাসও নিশ্চয় এই উৎসবের অবসরে একটা হেস্তনেস্ত করার অপেক্ষায় রয়েছে। তাহলে — এই তো উপায় রয়েছে হাতের কাছে। পুরোহিতরা বা রাজশক্তি — যেই তাকে শাস্তি দিক, তাদের জন্য অযথা বসে থেকে লাভ কি? বরং মিছে অপেক্ষা না করে বোঝাপড়ার মুহূর্তটিকে এগিয়ে আনা যাক্। সেই কাজেতে জুডাস ইসক্যারিয়ট নামক যুবকটি তাকে সাহায্য করতে পারবে। কথাটা ভাবতে ভাবতে রুটির টুকড়ো ভাঙল যীশু। এই ভোজে খমীর দেওয়া নরম রুটি খাওয়ার নিয়ম নেই। মিশর ছেড়ে বেরিয়ে আসার দিনে পলায়মান ইহুদী মায়েরা আটা মেখেও তা সেঁকে রুটি গড়ার সময় পায়নি। সেই মাখা আটার তাল মাথায় করে পালাতে পালাতে তা রোদ্দুরে শুকিয়ে ওঠে। শিশুরা ক্ষুধার্ত হয়ে কেঁদে উঠলে পরে তারা সেই কড়কড়ে আটা ভেঙে ভেঙে শিশুদের ক্ষুধা মিটিয়েছিল। সেই গল্প মনে রেখে পেসাখের সপ্তাহে ইহুদীরা খমীরের বিন্দুমাত্র গুঁড়ো ঘরে রাখে না। রাত্রির ভোজে অন্যান্য খাবারের সাথে রুটি থাকে শুকনো কড়কড়ে।

<u>কে লবে আমার ভার কহে সন্ধ্যারবি</u>

শক্ত রুটি ভেঙে ভেড়ার মাংসের ঝোলে ডুবিয়ে নিল যীশু, তারপর অনুচরদের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, ‘আজ রাত পুইয়ে মোরগ ডাকার আগেই তোমাদের মাঝে একজন আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে।’ হতবাক অনুচরদের মুখে রা

সরছিল না। গলা পরিষ্কার করে সাইমন পিটার বলল, 'কে সে কর্ত্তা — সে কি আমি ?' চুপ করে রইল যীশু, তার যা বলার বলা হয়ে গেছে। কিন্তু অনুচরেরা ব্যাকুল — এক এক করে প্রত্যেকেই সেই প্রশ্ন করে উঠছিল, কিন্তু নেতা তাদের নিরুত্তর। জুডাসের মুখ অস্বস্তিতে সাদা দেখাচ্ছিল, এবার সেও জিজ্ঞাসা করল, 'সে কি আমি ?' যীশু ধীরে সুস্থে ঝোলে ভেজান রুটিটি তার হাতে তুলে দিয়ে কানে কানে আস্তে শুধু বল্ল, 'যা করবার তাড়াতাড়ি কর, আর দেরী নয়।' জুডাসের মুখ হতে বাঁকা হাসিটি মুছে গেছে — সে একবার মুখ তুলে দেখলো যীশুর চোখের দিকে। কি দেখল সে সেই চোখে — ঠাট্টা, করুণা নাকি মমতাময় আশ্বাস ? কথা না বলে মাথা নীচু করে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল দ্রুত। অন্যেরা ব্যাপারটার মাথামুন্ডু কিছুই বুঝলোনা। কোথায় গেল জুডাস ? দলের টাকাকড়ির পুঁটলিটি তার জিম্মায় থাকে — কর্ত্তা কি তাকে বাজারে পাঠালেন ? কিছুই না ধরতে পেরে তারা খাওয়ায় মন দিল। ভোজের খাওয়া ঠান্ডা হয়ে আসছে — আর দেরী নয় ! তাদের সাথে যীশু আবারও রুটি ভেঙে নিল, কিন্তু এবারেও তা মুখে না দিয়ে সে তাকে ছোট ছোট টুকড়োয় ভেঙে সকলের হাতে তুলে দিতে লাগল, সাথে ঢেলে দিল অল্প করে আঙুরের তৈরী রক্তিম আসব। স্নেহে ভরা চোখ তুলে সে বলল তাদের, 'আমার রক্তমাংসের আমিকে তোমাদের সাথে মিশিয়ে দিলাম। এখন আমাকে যেখানে যেতে হবে, সেখানে তোমাদের কারুরই যাওয়া হবে না। কিন্তু ভয় পেও না। চোখের সামনে নাই বা রইলাম, তোমাদের অস্তিত্বে আমি রয়ে গেলাম মিশে, তোমাদের সকল কাজের দায় রইল আমার।' কর্ত্তা যে কি হেঁয়ালি বলে যাচ্ছেন, এই সহজ সরল মানুষগুলোর মাথায় তা ঢুকলো না। যীশু হাত ধুয়ে উঠে পড়ল, সামনের কয়েক ঘন্টায় তার দেহ মনের উপর চরম অত্যাচার নেমে আসছে — উত্তেজনা আর আশঙ্কায় তার সমস্ত শরীর এখন ছিলা পরান ধনুকের মত টানটান হয়ে উঠেছে — আর এক গরাস খাদ্য তার গলা দিয়ে নীচে নামবে না। একজন বল্ল, 'ও কি কর্ত্তা, আপনার তো কিছুই খাওয়া হলো না।' ঘর ছেড়ে বাইরে যেতে যেতে ফিরে তাকিয়ে বল্ল যীশু, 'এ পৃথিবীর মাটিতে আর খেতে বসবো না, এবার খেতে বসবো আমাদের পিতার ভোজসভায়।' কর্ত্তা অনেক সময় যা বলেন, তা তারা বোঝে না, এখনও বুঝলোনা। কি এক অজ্ঞাত ভয়ে তাদের মন ভারী হয়ে উঠল, কিন্তু কি করা উচিৎ না বুঝে খাওয়াটা সেরে ফেলার দিকে মন দিল। খাওয়া সেরে তারা শুতে যাবে কিছুদূরে গেটসেমেনির বাগানে — মনোরম জায়গা, খোলামেলা। রাতের বেলা সেখানে ঘুমিয়ে আরাম আছে।

<u>তবে বজ্রানলে বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে একলা জ্বলো রে</u>

অনুচরেরা ঘুমিয়েছে — যীশু বাইরে এসে দাঁড়াল — তারাভরা আকাশের আলোয় দূরে কিছু দেখা যাচ্ছে না — শুধু বাতাসে দুলে ওঠা গাছপালার শনশন চারিধারে। সে কান পাতল, যদি মন্দির রক্ষী বা রাজসৈন্যদের পায়ের শব্দ শোনা যায়, কিন্তু এখনও চারিধার নিঃশব্দ। এতক্ষণে যীশুর চোখ থেকে জলের ধারা নেমে এল। তার মন আর শরীর যেন এই মুহূর্তে দ্বিধা বিভক্ত — মন জানে যা সে করতে চলেছে, সেটাই ঠিক পথ, তাই তার মনে নেই কোন দ্বন্দ। অথচ তার শরীর এই মুহূর্তে আসন্ন যন্ত্রণার আশঙ্কায় কাতর ! মোটে বত্রিশ বছর বয়েস তার, প্রতিটি মাংস পেশী তার যৌবন চঞ্চল সুস্থ। আলোহাওয়া রূপ রস গন্ধ — সব কিছুকে সে উপভোগ করে সকল ইন্দ্রিয় দিয়ে — এই শরীর, এই পেশী একটু পরেই নিগৃহীত হবে সকলের সামনে, শিরা আর ধমনীতে বয়ে যাবে অকথ্য যন্ত্রণা আর তাকে থাকতে হবে স্থির অচঞ্চল-এ পরীক্ষা দিতে তাকে কেউ বলেনি। এ পথ সে নিজে বেছে নিয়েছে। আজ এই মুহূর্তে যদি সে জেরুসালেম ছেড়ে রাত্রের অন্ধকারে পাড়ি দেয়, মিশে যায় গ্যালিলির জনস্রোতে, কেউ তার নাগাল পাবে না। কিন্তু তবু তা সে করবে না। সে এইখানে অপেক্ষায় থাকবে সেই চূড়ান্ত অপমান ও অত্যাচারের, যাতে তাকে দেখে অন্যের মন হতে অত্যাচারিত হওয়ার ভয় মুছে যায়, মানুষের জন্য ভালোবাসা জেগে ওঠে, যে ভালোবাসা অন্যায়ের বিরুদ্ধে অটল থাকে। কিন্তু তবু এই প্রতীক্ষা তার দেহমন আর নিতে পারছে না — তার ভয় করছে — ভয় করছে নিদারুণ ভাবে — তার শরীর বিদ্রোহ জানাচ্ছে। কাঁদতে কাঁদতে সে উপুড় হয়ে পড়লো মাটির উপর আর অনুভব করলো দুঃসহ মানসিক চাপে তার শরীরের প্রতিটি রোমকূপ ফেটে ঘামের সাথে দরদরধারে বেরিয়ে আসছে তাজা রক্তের ধারা। মাটি ধরে নিজেকে সামলে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে করতেই ওধারে তার ঘুমন্ত অনুচরদের দিক থেকে একটা অস্পষ্ট কোলাহলের আওয়াজ ভেসে এলো। যীশু চোখ তুলে একবার আকাশের দিকে তাকালো, অস্ফুটে বল্ল 'পিতা — সময় হয়ে গেছে, তুমি আমার সহায় হয়ে থেকো।'

বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে

অন্ধকার ফুঁড়ে তার সামনে এসে দাঁড়ালো কয়েকটি মন্দিররক্ষী – খাইয়াপাসের দূত ! এই কয়েকদিন খায়াপাস সব কাজের মধ্যেও যীশু সম্বন্ধে খোঁজ খবর নিয়ে গেছে অনবরত । তার চরেরা যেসব খবর নিয়ে এসেছে এই ছোকরা ছুতোর সম্বন্ধে, তাতে সে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে যে একে সমূলে বিনাশ না করলে চলবে না । ছোকরা যেন তার মুখের উপর এসে তার অধিকারকে বিদ্রুপ করছে । গুজব শোনা যাচ্ছে যে, যে তার বাবা জোসেফ ইহুদীদের প্রসিদ্ধ রাজা ডেভিডের বংশধর, ঐ বংশেই ঈশ্বরের প্রতিভূর জন্ম হবে বলে শোনা যায় । জন্মানোর পর ঈশ্বরের প্রতিভূ গাধার পিঠে চড়ে জেরুসালেমে আসবেন এমন একটা কথারও চল আছে । আর এই হতভাগা ছুতোরের ছেলেটাও আবার ঢং করে গাধার পিঠে চড়ে উৎসবে যোগ দিতে এসেছে । গোটাকতক মূর্খ সেই দেখে খেজুরপাতা দুলিয়ে আবার জয়ধ্বনিও দিয়েছে নাকি ! চরেরা এ খবরও দিল যে ছোকরা নাকি কিছু কিছু জাদু টোনা বুজরুকিও শিখেছে – কখনো জলকে মদ বানিয়ে ফেলে, কখনও বা নেমন্তন্ন বাড়ীতে খাবার কম পড়লে আশ্চর্য ভাবে অঢেল খাবারের জোগাড় দেয় । বোকা লোকের দল বুজরুকটাকে ঈশ্বর বানিয়ে নাচানাচি করছে আজকাল, তাতে খায়াইপাসের আপত্তি ছিলোনা । এইরকম বুজরুকে তো এখন কেনান্ ছেয়ে গেছে । কিন্তু এ লোকটা আবার মন্দিরের কাজকর্মের বিরুদ্ধে মন্দিরের উঠানে ঢুকে লোক ক্ষেপাতে আরম্ভ করেছে । এর মৃত্যুর পরোয়ানা এ নিজেই লিখেছে, খাইয়াপাস আর কি করবে । শুধু ঐ ষন্ডাগুন্ডা সঙ্গীগুলির মধ্যে থেকে চিনে নিয়ে তাকে চট্ করে তুলে আনতে একটু মুশকিল হচ্ছিল । কিন্তু কাল রাত্রে লোকটার নিজেরই এক ভক্ত, নাম তার জুডাস, নিজের থেকে এসে তাকে ধরিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে, পরিবর্তে সে কেবল ত্রিশটি রুপোর মুদ্রা চায় ! তা দেবে খাইয়াপাস । এই রকম বিপজ্জনক শত্রুর হাত হতে উদ্ধার পেতে হলে ওটুকু কোন সমস্যাই নয় ।

রক্ষীদের সাথে দিয়ে জুডাসকে সে রওনা করে দিয়েছে । ওরা এসে পড়লে এই রাতের আঁধারেই সে পুরোহিতদের বিচার সভা ডাকবে । পরবের দিনে কিম্বা রাতের বেলা এধরণের বিচার সভা করা তাদের শাস্ত্রে অবশ্য মানা, কিন্তু বিপদে নিয়মো নাস্তি । ঐ অন্ধকারেই যীশুকে বিচার করে তার প্রাণদন্ড সেরে ফেলতে হবে ।

যীশু রক্ষীদের সামনে এসে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গেই এগিয়ে এল জুডাস । মধ্যপ্রাচ্যের প্রথায় চুম্বন করে অভিবাদন করল সে তার নেতাকে । এইটুকুই তার কাজ ছিল – এইভাবে অভিযুক্তকে চিনিয়ে দেওয়া । অন্ধকারের মাঝে আবার মিশে গেল সে, আর রক্ষীরা মুহূর্তের মধ্যে যীশুর হাত বেঁধে ফেলল । সদ্য ঘুমভাঙা কিংকর্তব্যবিমূঢ় অনুচরেরা হৈ হৈ করে উঠল, কিন্তু সেই অন্ধকার রাত্রিতে জেরুসালেমের অগণ্য তীর্থযাত্রীদের ভিড়ের মাঝে সে আওয়াজ কারুর কানে আলাদা করে পৌঁছালনা । মরীয়া সাইমন পিটার তার কোমরবন্ধ হতে ছুরি বের করে একজন রক্ষীর কাঁধে আঘাত করল, যীশু থমকে থামল – তারপর হাত বাড়িয়ে মুছে নিল লোকটির রক্তের ধারা । ফিরে দাঁড়িয়ে বলল সে, 'তোমাদের আমি এতদিন আজকের জন্যই প্রস্তুত হতে বলেছি । এই রক্ষীটিও তোমার ভাই । ভাইয়ের হিংস্রতার বদলে ফিরে আঘাত করতে যেওনা – যা ঘটছে তা পিতার ইচ্ছা, তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করো – বিচারের দায় তাঁর ।' রক্ষীর দল তাকে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যেতে লাগল, পিছনে মিলিয়ে গেলো তার ভক্তদের অসহায় হাহাকার কান্না । রক্ষীদের দলটির সাথে সাথে সেখানে এসেছিল উন্মত্ত এক জনতা, পেসাখের উৎসবে প্রাণ ভরে সুরাপান করেছে তারা । প্রধান পুরোহিত খাইয়াপাসের অনুগত এরা সকলেই । সেই তাদের বুঝিয়ে পাঠিয়েছে যে ভুঁইফোঁড় এই লোকটি স্বয়ং ইহাহুয়ের মন্দির ধ্বংস করার কথা বলেছে – এর সাজা না হলে ইহুদীদের দুর্দশার শেষ থাকবে না । রক্ষীরা যীশুকে বেঁধে ফেলার পর এই দলটি তাদের মাঝে ঢুকে পড়ে বন্দীর উপর আশ মিটিয়ে কিল ও ঘুঁষি ছুঁড়তে লাগল, কারুর দিক থেকে কোন বাধা এলনা ।

যীশুকে যেখানে নিয়ে আসা হলো তার নাম স্যানহেড্রিন । এটি একটি প্রাসাদ – মন্দিরের ক্ষমতাসীন পুরোহিতেরা এইখানেই বিচারসভা বসায় । আজ অবশ্য তারা ব্যস্ত ছিল পেসাখের ভোজে, কিন্তু দেখা গেল যে এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণার জন্য তারা সকলেই ভোজ থেকে উঠে চলে এসেছে । প্রথমে এগিয়ে এল আনাস নামে এক বৃদ্ধ পুরুত, সম্পর্কে সে খাইয়াপাসের শ্বশুর । জেরার ভঙ্গীতে ঝুঁকে পড়ে বল্ল, 'কি হে ওস্তাদ, তুমি নাকি যাজক, তা তোমার শিষ্যদের কি উপদেশ বিতরণ কর, একটু শোনাও দেখি আমাদের !' যীশু নিরুত্তর তার দিকে তাকিয়ে রইল । সে বুঝতে পারছে যে এই ভীতু

লোকগুলি তাদের কায়েমী স্বার্থের উপর আঘাত আসাতে ভীষণ ভয় পেয়েছে ! সেই জন্য – দূর্বলের যা সবচেয়ে বড় অস্ত্র অত্যাচার তাই দিয়ে এরা তাকে আঘাত করবে, এবং করেই যাবে যতক্ষণ না এরা তাকে মুছে ফেলতে পারবে। মূর্খ এরা – জানে না যে শরীরটাকে মুছে ফেললেও সত্যিকে মুছে ফেলা যায়না। এদের সাথে তর্ক করে সে কি করবে ? আনাস বারেবারে তাকে প্রশ্ন করেও কোন উত্তর পেল না।

এবার আসরে নামল খাইয়াপাস স্বয়ং; পান ভোজনে তার মুখখানি আরক্ত, বন্দীর একগুঁয়েমিতে তার মাথায় আগুন জ্বলছে। যীশুর দিকে এগিয়ে যখন চিৎকার করে উঠল সে, উত্তেজনায় তখন তার মুখের কষে সাদা ফেনা জমেছে, চোখদুটি লাল – 'বল্ কি উপদেশ দিচ্ছিস্ তুই এই মূর্খগুলিকে ?' 'যা বলেছি লুকিয়ে তো বলিনি, সবই তোমরা শুনেছ ! তা নাহলে আর তুমি আমাকে ধরে এনে জেরা করছ কেন ? কি অন্যায়টা বলেছি, সেটা না হয় তুমিই বল্লে !' ক্ষিপ্ত পুরোহিত চেঁচিয়ে উঠল, 'চালাকি করে পার পাবি না, তুই যা বলেছিস্ প্রতিটি কথার সাক্ষী আছে, তা জানিস্ ? এই সাক্ষীদের হাজির কর্।' আদেশমাত্র রক্ষীরা গুটি কতক লোককে টেনে আনল সেখানে। মাঝরাত্রে ঘুম থেকে উঠে এসে লোকগুলি বেশ ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেছে বোঝা গেল। কি যে তারা বলতে চাইছে, কিছুই পরিষ্কার হলো না। দুটি লোক অবশ্য গুছিয়ে বলতে পারল, যে এই ছোকরাই সেদিন মন্দির ধ্বংস হওয়ার কথা বলে চিৎকার করছিল, কিন্তু তাদের দুজনের বর্ণনা একে অন্যের সাথে এতটাই গরমিল হয়ে গেল, যে তাদের সাক্ষ্য রোমান কর্ত্তারা মেনে নিলে অবাক কান্ড ঘটবে। কেনানের ইহুদীরা যত ক্ষমতাই ধরুক, প্রাণদন্ড দেওয়ার অধিকার তারা রাখে না, তার জন্য রোমান রাজপুরুষদের অনুমতি প্রয়োজন হয়। রোমানরা আবার নিয়মকানুন সম্পর্কে বড্ড বেশী কড়াকড়ি করে, তা না হলে তাদের পক্ষে এই বিশাল সাম্রাজ্য শাসন সম্ভব নয়।

খাইয়াপাস এবার অন্য পথ ধরল। যীশুকে কোন কথা নিজের থেকে বলার সুযোগ না দিয়ে সে এবার সোজাসুজি আক্রমণ করল, 'হতভাগা, তুই বলিস্নি যে তুই নাকি ঈশ্বরের পুত্র ! সবাইকে উদ্ধার করতে এসেছিস্।' 'বলেছি তো, প্রলয়ের দিনে অন্য কেউ নয়, মানুষের সন্তানই তো বিশ্বপিতার সন্তান হিসাবে তাঁর কাছটিতে বসার অধিকার পাবে।' 'স্বীকার করেছে, স্বীকার করেছে' – উৎফুল্ল রব উঠল এবার। 'নিয়ে চল ব্যাটাকে বেঁধে রাজদরবারে। রোমান রাজপ্রতিভূ পন্টিয়াস পাইলট উৎসবের সময় সিসারা শহর থেকে এখানে এসেছেন, উনিই এই ব্যাটাকে প্রাণদন্ডের আজ্ঞা শুনিয়ে দেবেন।' খাইয়াপাস আর দেরী করলো না, দেরী করলে ব্যাপারটা কেঁচে যেতে পারে। রক্ষীদলের সাথে সে যীশুকে রাজদরবারের দিকে রওনা করে দিল। তার ইশারায় উন্মত্ত জনতার একটি দলও পিছু পিছু গেল। রাত জাগায় ক্লান্ত পুরুতের দল আড়মোড়া ভেঙে উঠে দাঁড়াল, এবার তারা ঘরে যাবে। এমনি সময়ে ঝড়ের মত সেখানে এসে উপস্থিত হল জুডাস ইসক্যারিয়াট। 'এ আপনারা কি করলেন ? যীশু যে নিষ্পাপ ! তাকে আপনারা মৃত্যু দন্ড দিলেন ? হায়, হায় কেন তাকে আমি আপনাদের কাছে এনে দিলাম !' বিরক্ত খাইয়াপাস বলল, 'গোল করো না তো বাপু। ঘরে যাও আর হ্যাঁ, এই যে চুক্তিমত তোমার ত্রিশটি রুপোর টাকা – নাও দিকি। ''কে চায় ? কে চায় আপনাদের টাকা ? টাকার জন্য এই কাজ আমি করিনি।'' মেঝের উপর টাকা ছুঁড়ে ফেলে ছুটে বেরিয়ে গেল জুডাস। বিব্রত পুরোহিতের দল খানিক মুখ চাওয়াচাওয়ি করল।

একজন বলল, 'টাকাটা কি তবে মন্দিরের সিন্দুকে তুলে রাখবে ফের ?' 'নাঃ, তার চেয়ে বরং ঐ টাকা দিয়ে অনাথ আতুর যেসব লোক মৃতদেহ গোর দেওয়ার পয়সা জোটাতে পারেন, তাদের জন্য কুমোরদের পাড়ার পোড়ো জমিটা কিনে ফেলা যাক !' বলল আনাস্। 'ভালোই হল – টাকাটার সদ্‌গতি হল একটা –' নিঃশ্বাস ফেলে ঘরের দিকে রওনা হল সকলে।

<u>ঘাতক সৈন্য ডাকি, মারো মারো ওঠে হাঁকি</u>

তখনো ভোরের আলো ভালো করে ফোটেনি, প্রাসাদের বাইরে উঁচু গলায় কাদের কোলাহলে পন্টিয়াস পাইলেটের ঘুম ভেঙে গেল। বিরক্ত হয়ে পাশ ফিরে ঘুমাবার চেষ্টা করলেন তিনি, কিন্তু কোলাহলের মাত্রা কমছে না কিছুতেই। কারা যেন তাঁকেই ডাকছে বারেবারে। এই ঐ ইহুদী জাতটার বড় দোষ, সর্বদা গোলমাল আর চেঁচামেঁচি – পাইলেট এদের সহ্য করতে

পারেন না বলেই সিসারার প্রাসাদে সরে থাকেন। কিন্তু এখন তো সরে যেতে পারবেন না। এরা রোমের প্রজা, তিনি রাজার প্রতিনিধি। সেই হিসাবে এদের কি নালিশ সে ব্যাপারটাও জেনে নেওয়াই দস্তুর। পন্টিয়াস ঘুমের আশা ছেড়ে মুখহাত ধুয়ে বাইরে এলেন –

প্রাসাদের সামনের সিঁড়ির চাতালে ইতিমধ্যেই নফরেরা সাজিয়ে ফেলেছে বিরাট এক বিচার সভা – এনে রেখেছে হাত ধোয়ার জলের পাত্র আর স্বর্ণমন্ডিত এক সিংহাসন। পন্টিয়াস হাত ধুয়ে ধীরেসুস্থে সিংহাসনে উঠে বসলেন, তারপর গোলযোগের কারণ জানতে চাইলেন। জনতার অগ্রভাগে রক্ষীরা একটি যুবককে বেঁধে এনেছে। – ছেলেটির সারা গা ধূলিধুসরিত, কাপড় ছেঁড়া, শরীরের জায়গায় জায়গায় কালশিরা পড়েছে। তাঁর প্রশ্নের উত্তরে সেই ছেলেটির বিষয়ে নালিশ শুরু হল – সবাই একসাথে কথা বলতে চায়, কে কি বলছে বোঝা মুশকিল। সবাইকে থামিয়ে একজন একজন করে যেটুকু বোঝা গেল, তা হল যে সে রাজদ্রোহী, নিজেকে ঈশ্বরের সন্তান বলে পরিচয় দেয় আর বলে সে হল ইহুদীদের রাজা। রাজদ্রোহ – অপরাধটা গুরুতর, পাইলেট খুব মনোযোগ দিয়ে সকলের বক্তব্য শুনলেন, তারপর ছেলেটিকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কি বলতে চাও যে এই কেনান্ রাজ্যে তুমি রাজা ?' ধীর সুরে উত্তর এল, 'আমি যে রাজ্যের কথা বলে থাকি, তা এই মাটির পৃথিবীর রাজ্য নয় – তার রাজা স্বয়ং ঈশ্বর।' এই বক্তব্যের সঙ্গে রাজদ্রোহের সম্পর্ক নেই। রোমানরা কেনান্ রাজ্যের অধিকার নিয়ে চিন্তা করে, কোন্ ধর্মোন্মাদ ঈশ্বরের রাজস্বত্ব নিয়ে কি বল্ল, তা নিয়ে পন্টিয়াস কেন মাথা ঘামাবেন ? তিনি জনতাকে জানালেন বন্দীকে তিনি মুক্তি দিতে চান, সে রাজদ্রোহী নয়। পুরোহিত গোষ্ঠীর অনুগত জনতার মধ্যে অসন্তোষের গুঞ্জন উঠল। তারা বারেবারে বলতে লাগল, বন্দী দোষী, সে নিজেকে ঈশ্বরের পুত্র বলে দাবী করে। এ ব্যাপারটিতে পাইলেটের উৎসাহ আরও কম। ব্যপারটা একান্তই ইহুদীদের ধর্মবিশ্বাস নিয়ে – এর জন্য রোমের প্রতিভূর কিছুই করার নেই। তিনি নির্লিপ্তভাবে সভা ছেড়ে উঠে পড়লেন, কিন্তু ক্ষুব্ধ জনতার চিৎকারে তাঁর গতি রোধ করল। তারা খুশী নয় তাঁর বিচারে, তারা যীশুর মৃত্যু চায়, তাদের প্রভু খাইয়াপাস এইরকমই তাদের শিখিয়ে পাঠিয়েছে। পন্টিয়াস বিচারকের সিংহাসনে ফিরে এলেন – উৎসবের ভীড় এখনো নগর ছাড়েনি, এখন এরা ক্ষেপে উঠলে বিরাট রক্তারক্তি দাঙ্গা লেগে যেতে পারে। সমস্যাটার একটা সমাধান দরকার। একটু ভেবেই সেই সমাধান তিনি খুঁজেও পেয়ে গেলেন। পরবের দিনে রোমানদের মধ্যে কখনো কখনো কোন এক বন্দীকে মুক্তি দেওয়ার প্রথা রয়েছে। এই মুহূর্তে নগরের কারাগারে এক খুনী দস্যু ও বিদ্রোহী বন্দী রয়েছে, নাম তার বারাব্বাস। পন্টিয়াস জনতাকে বারাব্বাস অথবা যীশু – দুইজনের মাঝে একজনের মুক্তি বেছে নিতে বল্লেন। উল্লসিত জনতা চিৎকার করে জানাল তারা বারাব্বাসের মুক্তি চায়। পন্টিয়াসের আর কিছু করণীয় রইল না; তিনি তাদের ইচ্ছামত রায় জানিয়ে তাঁর হাতদুটি ধুয়ে ফেলে আনুষ্ঠানিক ভাবে বিচার সভা সমাপ্ত করে অন্দরে ফিরে গেলেন। তাঁর পিছনে জনতার হিংস্র উন্মত্ত আনন্দকোলাহলে আকাশ ফেটে পড়তে লাগল।

<u>আমি মারের সাগর পাড়ি দেব গো</u>

এই সমস্ত ঘটনার মাঝে নিরাসক্ত ভাবে দাঁড়িয়ে রইল বন্দী যীশু। আশ্চর্য ! এখন তার মন এখন নির্ভার – যে ঘটনার জন্য সে এতদিন মনে মনে প্রস্তুত হয়েছে, অনেকটা নিজেই সে যা ঘটিয়ে তুলেছে – আজ সেই ঘটনার মাঝখানটিতে সে এসে দাঁড়িয়েছে, আর তার কিছু করার নেই। এখন শুধু বিনা প্রতিবাদে, শান্তভাবে আত্মবলিদানের প্রতীক্ষা, সকলের উপকারের জন্য স্বার্থলোভীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে নির্ভীক ভাবে প্রতিবাদ করা, মানুষের ঘৃণার পরিবর্তে তাদের ভালবাসার উদাহরণ তুলে ধরা – এই তার কাজ। যীশু মনে মনে শক্তি প্রার্থনা করতে লাগল – সে যেন ভেঙে না পড়ে। এতদূর এগিয়ে এসে তার দেহের কষ্ট যেন তাকে দূর্বল না করে ফেলতে পারে। সে জানে যে তাকে সকলের চোখের সামনে চূড়ান্ত অপমান সহ্য করে তিলে তিলে মরতে হবে, এই মুহূর্তে সে যদি মানুষের প্রতি তার ভালবাসা আর বিশ্বাস হারায়, তাহলে তার মৃত্যু বৃথা হবে ! মুখের একটি রেখাও বিকৃত না করে সে মনে মনে বলতে লাগল, 'পিতা, পিতা – আমার হাত ধরে থাকো।' তাকে ঘিরে কুশ্রী রসিকতার ঢেউ বয়ে যেতে লাগল, কেউ বা বলল, 'ওহে রাজাকে একটা রাজবেশ পরিয়ে দাও।' অমনি একটি ঘন বেগুনী কাপড়ে তাকে ঢেকে দিয়ে কুর্ণিশ করে খলখলিয়ে হেসে উঠল আরেক জন। কে যেন চেঁচিয়ে বল্ল, 'আরেঃ, রাজামশায়ের মাথায় মুকুট নেই যে। ওনার মুকুটের জোগাড় কর।' কাঁটা দিয়ে বোনা একটি মুকুট এনে একজন

তার মাথায় চেপে বসিয়ে দিতে হো হো হাসির ঢেউ উঠল। কাঁটার চাপে মাথা আর কপাল ছড়ে গেল তার, গড়িয়ে এল রক্তের ধারা। তাই দেখে তার গায়ে কেউ বা থুথু ফেলল, কেউ আমোদে অস্থির হয়ে চাবুকের বাড়ি কষাল ঘা কতক! এদের কারুর সাথে যীশুর কোন বিবাদ নেই। বেশীর ভাগ লোক তাকে চেনে না — তারা তারই মতন খেটে খাওয়া মানুষ। কিন্তু এই মুহূর্তে তাকে খুঁচিয়ে যন্ত্রণা দিয়ে তারা নিজেদের শক্তিমান ভাবছে। সারাটা সকাল বেড়াল যেমন ইঁদুর নিয়ে খেলে, তেমনি করে তাকে নিয়ে খেলল সবাই। বেলা যখন দুপুর প্রায়, রাতজাগা লোকগুলির ঝিমুনি আসতে শুরু করল। এবার একটু নতুন আমোদ করার জন্য তারা তার পরনের বেগুনী কাপড়টি কেড়ে নিল, সেই সাথে খুলে নিলো অন্যান্য যা কাপড় জামা, আগে হতে তার পরনে যা ছিল। এইবার তার কোমরে একটি কানি জড়িয়ে দিয়ে এলোপাথাড়ি চাবুক মারতে মারতে তাকে নিয়ে রোমান সৈন্যের দল বধ্য ভূমির দিকে রওয়ানা হল।

যীশুকে যখন পন্টিয়াসের দরবারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন স্যান হেড্রিনের বাইরে বসে আগুন পোয়ানোর ছলে তার অপেক্ষায় ছিল পিটার সাইমন। একজন দাসী এসে তাকে খবর দিয়ে গেল, 'তোমার গুরুটিকে যে মরার সাজা দেওয়া হল গো।' মরার সাজা? হতবাক পিটার দাসীটির মুখের দিকে তাকিয়ে রইল হাঁ করে। দাসীটি বল্ল, 'কি হল, ঐটি তোমার গুরুদেব নয়? কাল মন্দিরে ওনার পিছু পিছু তো ঘুরঘুর করছিলে দেখেছিলাম।' ঠক্‌ঠক্‌ করে কেঁপে উঠেছিল পিটার, 'কে বল্ল যে সে আমার গুরু? এমন কোন লোককে আমি চিনিনা!' তড়িঘড়ি সেখান থেকে পালিয়েছিল সে — কর্ত্তার মত লোককে যদি মরতে হয়, তবে তার এদের হাতে কি দশা হবে? সে যে গ্যালিলিতে বৌ বাচ্চা নিয়ে ভরা সংসার ফেলে এসেছে। মাথায় থাকুন কর্ত্তা, পিটার এখন বাড়ি ফিরে যাবে! কিন্তু ভাবলে কি হবে, কর্ত্তার শেষ না দেখে সে ফিরতেও পারছিল না — তার বুকের মধ্যেটা টনটন্‌ করছিল যন্ত্রণায়। ভিড়ের মধ্যে গা ঢাকা দিয়ে দূর থেকে সে যীশুকে অনুসরণ করে যাচ্ছিল। সে জানতো না, কিন্তু তার দলের অন্যান্যরাও ঠিক তার মতনই গা ঢাকা দিয়েছিল, সৈন্যদের কাছে ধরা পড়ার ভয়ে লুকিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল।

যীশুকে যখন রাজপথে বের করে আনা হল, সে একবার চোখ তুলে তাকালো চারিধারে, দেখল তার সঙ্গীরা আশেপাশে কেউ নেই। হাসল সে মনে মনে — আর তার মনে কোন সন্দেহ নেই, যে সে ঠিক পথটি বেছে নিয়েছে। অত্যাচারের মুখে তার অনুচরেরা ভয় পেয়েছে। এমনটা যে হবে তা সে বুঝেছিল আর তাদের ভয় ভাঙাতেই তো আজ সে এই পথ বেছে নিয়েছে। জনতার একপাশে দাঁড়িয়ে তার মা মেরী আর সেই বারবনিতা মেরী ম্যাগডালেন কেবল চোখের জলে ভেসে যাচ্ছিল। চোখ পড়তে দাঁড়িয়ে পড়তে চেষ্টা করল সে, বলল 'কেঁদো না তোমরা। ঈশ্বরের রোষ নেমে আসছে এ শহরের উপর — এরা তা দেখতে পাচ্ছে না। এ অবস্থায় সন্তানহারা মা অধিকতর ভাগ্যবতী — তাকে নিজের চোখে সন্তানের শাস্তি দেখতে হবে না।'

<u>আরো আরো প্রভু আরো আরো</u>

গতি রোধ হওয়ায় বিরক্ত সৈন্যরা কশাঘাত করলো তাকে। মুখ থুবড়ে পড়ে গেল যীশু। তার পিঠে তখন তুলে দেওয়া হয়েছে আড়াআড়ি করে বসানো ভারী দুটি কাঠ বা ক্রস। তাকে এখন নিয়ে যাওয়া হচ্ছে নগরপ্রান্তে গলগথা বা ক্যালভারি পাহড়ের দিকে। পাহাড় না বলে তাকে ঢিবি বলাই বোধহয় সঙ্গত — ন্যাড়া ঢিবি — তাকে দেখলে নর করোটির কথা মনে পড়ে যায়। দুপুরের ধু ধু রোদ্দুরে সেটি যেন পুড়ে যাচ্ছে। ঢিবি বেয়ে উঠতে উঠতে যীশু আবারও মুখ থুবড়ে উপুড় হয়ে পড়ে গেল — এবার আর তার উঠে দাঁড়ানোর ক্ষমতা হলো না। কাল রাত্তির হতে তার খাওয়া নেই, তৃষ্ণার জল পর্যন্ত পায় নি সে। তার উপর চলেছে সমানে কশাঘাত আর অন্যান্য বিকৃত বিদ্রুপ। সৈন্যরা কয়েকবার চাবুক চালিয়ে তাকে তুলতে চেষ্টা করল, কিন্তু ভারবাহী পশু যেমন পা ভেঙে পড়লে আর তাকে তোলা যায়না, তার বত্রিশ বছরের যুবক দেহটিও তেমনি নির্বল আর অক্ষম এই মুহূর্তে। উপায়ান্তর না দেখে সৈন্যরা পথচলতি এক হতভাগ্যকে চাবুক মেরে ক্রসটি কাঁধে তুলে নিতে বাধ্য করল। গলগথার চূড়ায় পৌঁছে তাকে বলা হল, সেটিকে মাটিতে পেতে দিতে, আর যীশুর উপর আদেশ হল তার উপর হাত পা মেলে শুয়ে পড়ার। বিনা বাক্যব্যয়ে আদেশ পালন করলো সে। শূন্য পাকস্থলী গরমে রোদ্দুরে পাক্‌ দিয়ে উঠছে তার — ঝলকে ঝলকে পিত্ত বমি উঠে আসছে গলা দিয়ে। একবার অস্ফূটে গলা দিয়ে শব্দ করল সে, 'একটু জল,

একটু জল ।’ হেসে উঠল সৈন্যরা, পিত্তটুকু চেঁছে নিয়ে টকে যাওয়া আঙুরের রসের সাথে মিলিয়ে ঢেলে দিল তার মুখে । বিস্বাদে আবারও বমি হয়ে গেল তার – আবারও তা চেঁছে নিয়ে সেটি টোকো রসে মিলিয়ে রাখল সৈন্যদল । শিগগীরই এই লোকটা মরে যাবে, তার আগে তাকে নিয়ে সবটুকু আমোদ করে নিতে চায় তারা । যীশুর হাতের আর পায়ের পাতায় এবার হাতুড়ির ঘায়ে পেরেক ঠুকে তাকে আটকে দেওয়া হল ক্রসের সাথে – ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল তার ধমনী আর শিরা । ব্যথায় কুঁকড়ে উঠছিল তার সমস্ত শরীর, তার গায়ের চাবুকের ঘায়ে গড়িয়ে আসা রক্তের গন্ধে ভিন্‌ভিন্‌ করছিল মাছি, আর সে – যীশু সর্ব শক্তি দিয়ে চেষ্টা করছিল যেন তার মনে রাগ বা প্রতিশোধ না দেখা দেয় । বারেবারে পরম পিতাকে ডেকে বলছিল সে, ‘ক্ষমা – এদের ক্ষমা কর পিতা ।’ সেই ক্ষমার ভেতর দিয়েই সে নিজের মুক্তি খুঁজছিল ।

সৈন্যরা এইবারে ক্রসটির উপর বড় করে লিখে দিল, ‘ইহুদীদের রাজা এইখানে ।’ তারপর হাসতে হাসতে বলল, ‘ওরে ঈশ্বরের ব্যাটা, এইবার তোর ক্ষমতার খেলা দেখা – ডাক্‌ তোর বাপকে – তোকে বাঁচিয়ে নিয়ে যাক্‌ ।’ হাসতে হাসতে ক্রসটি তুলে দাঁড় করিয়ে দিল তারা, আর তারপর যীশুর পরণের কাপড়গুলো ভাগ করে নেবে বলে জুয়া খেলতে বসল ।

<u>সমুখে শান্তিপারাবার</u>

অসহ্য চাপ পড়ছে যীশুর গলায় – নিরলম্ব ঘাড়টি ক্রমশঃ ঝুলে পড়ছে – নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে । রোদ্দুর তীব্র হয়ে উঠছে – যীশু তার কালো হয়ে আসা জিভ বের করে শুকনো ঠোঁট চেটে নিতে চেষ্টা করল একবার – অস্ফুট আওয়াজে আবারও কাৎরে উঠল সে, ‘জল, একটু জল ।’ বুঁজে আসা চোখ কষ্টে টেনে খুলে দেখল, দাঁত বের করে হাসতে হাসতে আবার সেই পিত্ত মেশানো রস নিয়ে আসছে সৈন্যের দল । শক্ত করে ঠোঁট চেপে রইল সে । ‘প্রাণ বের হতে কতক্ষণ লাগে ? কেন এখনো যন্ত্রণার শেষ হয় না ? মৃত্যু আসতে এতো সময় নিচ্ছে কেন ? সে এখনও কারুকে ঘৃণা করেনি, এখনও অত্যাচারীদের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করে চলেছে – কিন্তু আর কতক্ষণ পারবে সে ? কষ্টে বলে উঠল সে, ‘হে ঈশ্বর, তুমি কি আমার কথা ভুলে গিয়েছ ?’ রোদ্দুর কমে এলো, সন্ধ্যা নামছে । যীশু বুঝতে পারছে তার শ্বাস স্তিমিত হয়ে আসছে – আঃ, এতক্ষণে মুক্তি কি এলো ? এমনি সময়ে তার চোখ পড়লো ঘনিয়ে আসা অন্ধকারে গলগথার প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকে এক নারীর অবয়বের দিকে – মেরী – তার মা ! এই মুহূর্তে যীশু বুঝলো যে তার এই আত্মত্যাগের থেকেও বড় ত্যাগ করেছে ঐ নারী । কুমারী অবস্থায় সমাজের রক্তচক্ষুর ভয় না করে যে তাকে জন্ম দিয়েছিল, মানুষ করেছিল পরম মমতায় আর তার পরে পৃথিবীর প্রয়োজনে তাকে ছেড়ে দিয়েছিল পথে । আর আজ সবশেষে যে নিজের চোখের সামনে তাকে তিলে তিলে শেষ হয়ে যেতে দেখছে তবু প্রতিবাদ জানাচ্ছে না সেই ঈশ্বরের বিরুদ্ধে, যিনি তাকে এই বিষম পরীক্ষার মধ্য দিয়ে নিয়ে গিয়ে আজ তার কাছ হতে সেই সন্তানকে কেড়ে নিয়ে যাচ্ছেন । শেষ নিঃশ্বাসটুকু দিয়ে সে ডেকে উঠল, ‘মা – মাগো !’ আর সেই সময় তার নিভে আসা চোখের দৃষ্টিতে ধরা পড়ল গলগথার এক কোণে নিজেকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে জন্‌ – তার সব ভক্তদের মাঝে সেই একা সাহস করে এখানে এসে দাঁড়িয়েছে । ফিস্‌ফিস্‌ করে যীশু শুধু বলতে পারল, ‘জন, মাকে দেখো । মাগো – ঐ রেখে গেলাম তোমার সন্তান ।’ তারপর তার মুখে নেমে এলো প্রশান্তি, খুব আস্তে সে বলল, ‘এবার সব শেষ – প্রভু তোমার পায়ে আমার নিজেকে দিলাম ।’

জেরুসালেমের নগরপ্রান্তে একটি গাছের তলায় এসে দাঁড়াল উদ্‌ভ্রান্ত একটি লোক – গাছটির দিকে খানিক শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সে । তারপর উঁচু ডালের দিকে ছুঁড়ে দিল একটি দড়ি । . . . . . শূন্য গাছের একটি ডালে ঝুলে রইল হতভাগ্য জুডাস ইসক্যারিয়াট . . . . .

সমাপ্ত

দেবীপ্রিয়া রায় – লিখছেন স্কুল ও কলেজের দিন থেকে । পেশায় দর্শন ও তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের অধ্যাপিকা ও গৃহিণী । কাশীর প্রবাসী বাঙালী পরিবারের মেয়ে দেবীপ্রিয়া কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৭৬ সালে ডক্টরেট করে বিবাহসূত্রে সেই বছরেই আমেরিকা এসে শিকাগো শহরে বাসা বাঁধেন । গত ৪০ বছর শিকাগোর বাঙালী ও অবাঙালী সমাজের সাথে নানা ভাবে জড়িয়ে রয়েছেন । সাহিত্য চর্চা দেবীপ্রিয়ার নেশা । শিকাগোর উন্মেষ সাহিত্য গোষ্ঠীর তিনি অন্যতম সদস্য ।

স্বর্ভানু সান্যাল

আঁতেল

পর্ব ২

নচিকেতা যেমন মহারাজ যমকে প্রশ্ন করেছিল মরণের ওপারে কি সেইরুপ স্ববাবু মহারাজ যযাতিকে প্রশ্ন করলে

“এই যে দেখি উঁচু প্রাচির তোলা আঁতেল নগর। ওর ওপারে কি মহারাজ? কেমনে প্রবেশ করব সে রাজ্যে.... দু চারটে কবিতা লিখেছি, জীবনানন্দ এমনকি সমর সেনও পড়েছি কিছু কিছু.... কিন্তু কোনভাবেই ও রাজ্যে এন্ট্রি ভিসা পাচ্ছি না ।”

মহারাজ যযাতি বললেন “শোনো বৎস.... আঁতেল রাজ্যে অধিকার অত সহজ নয়.... সকলেই আঁতেল নয়, কেউ কেউ আঁতেল” কে একটা লিখেছিলেন। ঠিক মনে করতে পারছি না.... যাকগে.... আঁতেল রাজ্যে প্রবেশের সবচেয়ে প্রাথমিক শর্ত হল সার্কাজম। একটা সতেজ, সফেন, জালাময়ী সার্কাস্টিক লাইন ভেবে যদি রোজ ক গাছি চুল না পাকিয়েছ তবে বনলতা সেন কিম্বা নীরা মত নারীরা পাখির নীড়ের মত চোখ নিয়ে তোমায় চেয়েও দেখবে না.... এফবি তে সেই লাইনটা ঝেড়ে উইমেন রিডারশিপ বাড়াতে হবে। পুরুষ প্রাণিটা ব্রুট, পাতে দেয়য়ার মত নয়.... উইমেন ফলোয়ার চাই। বুঝলে?

প্রভু কিরুপ এই সার্কাজম?

সার্কাজম অর্থাৎ শাঁশালো খুলির অর্গাজম। এইটি তোমায় শিখতে হবে.... হরিণের মত লঘুপদ আর অ্যাজাইল হতে হবে এই সার্কাজম। এবং পানিং থাকা ইজ অ্যাবসলিউটলি মাস্ট....

শুধু সার্কাজম হলেই হবে প্রভু?

ইয়ে না, আর কিছু শর্তাবলী আছে.... যেমন ধরো যে দেওয়ালকে সক্কলে সাদা বলেছে তোমায় সেখানাকে ঝপ করে কালো বলে দিতে হবে.... শুধু বললেই হবে না.... ধারাল বিশ্লেষণ আর “reason” এর সিমেন্ট দিয়ে আর উইকিপিডিয়া লিঙ্ক এর ইঁট দিয়ে তোমার যুক্তি প্রাচির খাড়া করতে হবে যেটা “beyond doubt” প্রমাণ করবে দেওয়ালটা আদতে কালো.... সবাই যা বলছে সেটা বলার এই আঁতেল সমাজে একটা গাল ভারি নাম আছে.... চর্বিত চর্বণ.... গরু জাতীয় প্রাণিরা এই কাজ করে থাকে। যদিও তারা মানুষের মত জানা-অজানা-অর্ধজানা সকল বিষয়ে নিজেদের মতামত দিয়ে প্রতিনিয়ত নিজেদের নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দেয় না, তবুও তাদের বুদ্ধি তেমন জোরদার নয় বলে শোনা যায়। তো এই চর্বিত চর্বণ করা নৈব নৈব চ....

প্রভু আর?

আর for God’s sake, হাজার পাতা লেফটিস্ট লিটারেচার পড়ে নিও.... কিছু যদি না বোঝ, নিদেনপক্ষে ইম্পর্টান্ট টার্ম গুলো রোজ একটু ঝালিয়ে নিও.... আর কিউবার ইতিহাসটা.... যদি তোমার প্রলেতারিয়াত শুনে প্রহেলিকার মত লাগে, তবে আঁতেল নগর থেকে পত্রপাঠ বিদায়.... আঁতেল ক্লাসরুমের বাইরে তখন তোমাকে কান ধরে নিলডাউন করে রেখে দেবে.... আর হাসিটা.... হাসিটার ওপর একটু কাজ করতে হবে.... কিছু বোঝ বা না বোঝ একটা মোনালিসা টাইপ “knowing smile” মুখে সারাক্ষণ ঝুলিয়ে রাখতে হবে....

এতেই হবে?

অনেকটাই হবে.... “hungry generation” গাঁতিয়েছ?

আজ্ঞে ষাটের দশকের লিটারারি মুভমেন্ট যাতে....

ব্যাস ব্যাস ওতেই হবে.... কোন কিছু ভাল করে না জানলেও চলবে.... কিন্তু সবকিছু কিছু কিছু জানা আবশ্যক.... ঐটা

একটা বড় ক্রাইটেরিয়া.... আর সিগারেটটা.... হ্যাঁ ঐটা হল আঁতেলদের সর্বোত্তম props.... যুক্তি সাজানোর সময় it gives you “time to breathe”.... কিন্তু আজকাল এই props এর সাহায্য ছাড়াও অনেকে আঁতেল নগরে প্রবেশাধিকার পাচ্ছে.... যেমন চিনচুড়ার স্বর্ণবাবু.... কিন্তু সে ভারি শক্ত.... ঈশ্বরে বিশ্বাস কর ?

হ্যাঁ প্রভু....

কেলো করেছে.... ঐটি ছাড়তে হবে যে.... ঝটাপট year end resolution নিয়ে নাও.... quit belief in God.... অত কিছু করেও কিছুতেই তুমি আঁতেল নগরের চৌকাঠ পেরোতে পারবে না ঐ একটা গর্হিত অপরাধের জন্য। তা দ্বৈত না অদ্বৈত, সাকার না নিরাকার ?

আজ্ঞে প্রভু অদ্বৈত....

তাহলে হাভানা তামাকের মত কড়া, ইজিপ্সিয়ান সুন্দরীর চোখের মত চোখা যুক্তি সাজাতে পারলে exemption পেয়ে যেতেও পার.... কিন্তু সাকার একেবারেই.... বুঝলে কিনা। ভালো কথা, তুমি বাপু রবি ঠাকুর পড়োটড়ো নাকি আবার ?

আজ্ঞে হ্যাঁ.... রবীন্দ্রনাথ বেশ ভালো লাগে।

উঁহুহু। একদম নয়.... আজ থেকে পুরোপুরি বন্ধ। তোমার দেখছি মস্তিস্ক প্রক্ষালন করতে হবে।

আজ্ঞে ?

মানে ভুলে যেতে হবে.... সব রবিঠাকুরের one-liner ভুলে যেতে হবে.... ওনার মানবদেবতা মরেছে বহুদিন হল.... সেক্স, ভায়োলেন্স আর উইমেন অ্যানাটমি এই তিন বিষয় ছাড়া স্ট্রিক্টলি আর কোন পোয়েট্রি পড়বে না.... আর বড়জোড় আর্থিক বৈষম্য আর শাষক-শোষক টাইপ্স লেখা.... রবির প্রকৃতি প্রেমে পড়েছ কি মরেছ। আতেঁল সমাজে এরও একটা গালভরা নাম আছে। পরিবর্তনবিমুখতা। আধুনিক গান, কবিতা, সিনেমা তা পর্নো হলেও তাকে স্বর্ণ অর্থাৎ সোনা মনে করে স্বাগতম করতে হবে।

এ তো ভারি গ্যাঁড়াকল....

আর কবিতা লেখো টেখো বললে না। একটা ব্যাপার মনে রাখবে, যদি লেখার পরে দ্বিতীয় বার পড়ে কোন মানে উদ্ধার করতে পারো, ব্যাস তৎক্ষণাৎ সেটাকে ছিঁড়ে ডাস্টবিনে ফেলে দেবে। যদি সত্তর বার পড়েও কবিতাটির কোন মানে বোঝা না যায়, তবেই সে কবিতার প্রকৃত কাব্যনির্যাস আর কবি তবেই আতেঁল স্তরে উন্নীত হবে। আজ্ঞে বুঝেছি। এ তো দেখছি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব পাওয়াও এর থেকে সোজা মহারাজ....

অনেক.... আমি বলি কি ঐ চেষ্টাই করো। আঁতেলনগরে প্রবেশ করার এই গোলমেলে প্রতিযোগিতায় যোগ দিও না....

(চলবে)

স্বর্ভানু সান্যাল – জন্ম হাওড়ার রামরাজাতলায়। ছাত্রজীবন কেটেছে পুরুলিয়া, হাওড়া ও দুর্গাপুরে। কর্মজীবনে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। চাকরিসূত্রে বিভিন্ন দেশ ঘুরে শেষ নয় বছর আমেরিকার শিকাগোয় কর্মরত। পেশাদারি এবং পারিবারিক জীবন বাদ দিলে, তার অনেকটা সময় কাটে সাহিত্যচর্চা করে। অনুগল্প, রম্যরচনা, কবিতা, স্মৃতিকথা নিয়মিত লিখে থাকেন। ‘‘যযাতির ঝুলি’’ (https://jojatirjhuli.net) নামে তার ব্যক্তিগত ব্লগ আছে এবং সেই ব্লগ এর মাধ্যমে তার লেখা নিয়মিত পাঠকদের সাথে ভাগ করে নেন। ব্লগটি বেশ জনপ্রিয় এবং সেটির সাথে লিঙ্কড একটি ফেসবুক পেজও আছে (https://www.facebook.com/jojatirjhuli)। প্রতিটা লেখকের মধ্যেই বাস করে তার লেখার এক চরম ও নির্দয় বিচারক। স্বর্ভানুর বিচারে সে সাহিত্য সাগরের ধারে বসে শুধুমাত্র নুড়িই কুড়িয়েছে। অন্য শখের মধ্যে আছে বেড়ানো, ফটোগ্রাফি, গান শোনা। আর অবশ্যই কারণে অকারণে একটু গড়িয়ে নেওয়া।

পল্লববরন পাল

সনেটগুচ্ছ

সনেট ৫

দক্ষিণাপণ-সিঁড়ি সাক্ষীগোপাল
মধুসুদনে নাটক – নাম 'মধুশশী'
জোড়ায় জোড়ায় ছিলো মানুষ-মানুষী
এবং পালি ও আমি – দুই বৈকাল ।
আমরা তৈরি করছিলাম কথার
কংক্রিট সেতু – যাতে বেঁধে রাখা যায়
বোধ আর শব্দের গাঢ় চর্চায়
কবিতার সাথে কিছু নির্জনতা ।

গড়িয়াহাটের মোড়ে ধরেছি তোমার
ডানহাত সম্ভ্রমে – না বাজলো শাঁখ,
তবু সেতু বেয়ে চালু পরিক্রমার
কপোত-কপোতি হেঁটে যায় লাখে লাখ

সেতু দিয়ে হেঁটে গেছি – মনে আছে, পালি ?
মেঘনাদবধ থেকে ইন্ডাস্ ভ্যালি

সনেট ৬

কেউ যেন এসেছিলো অর্কুট ঘরে
বিনা অনুমতিতেই, ফিরে গেছে চলে
আমাকে না পেয়ে ঘরে – শাড়ির আঁচলে
নিয়ে এসেছিলো ফুল ? খাটের ওপরে
দেখি – একা শুয়ে আছে একটি কুসুম
লন্ডভন্ড ঘরে অচেনা এ ঘ্রাণ
যতো বুকে ঢোকে – আমি মধু-ম্রিয়মান
অশ্বের টগবগে ছুটে গেলো ঘুম
উচ্চৈঃস্বরে বলি – 'কে আপনি, নারী ?'
পাপড়িতে কম্পন, উত্তর – 'আমি'
'আমি তো সবাই' – ফের বলি তাড়াতাড়ি
'জানিনা কে আমি' – বলে হেসে ওঠে বামি

'কেউ কি জানে ? – এমন প্রশ্ন করুন
আছে যার উত্তর' –
দারুন ! দারুন !

কর্মসূত্রে বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যের মাস্কাট শহরে একটি নামী বহুজাতিক কন্সাল্টেন্সি কোম্পানির চিফ্ আর্কিটেক্ট, আর মর্মসূত্রে আগাপাশতলা এক বামপন্থী বিষণ্ন কবি – প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ১৫ – যার মধ্যে আছে দুটি উপন্যাস – একটি গদ্য, একটি পদ্যে লেখা। গান, ছবি আঁকা, আর পড়াশোনা – খুব কাছের বন্ধু এই তিনজন।

মৌসুমী রায়

লাদাখ ভ্রমণ

পর্ব ৩

লেহ এর এই হোটেলটা বেশ সুন্দর সাজানো গোছানো। নানা রঙবেরঙের পাহাড়ি ফুল লনের চারপাশ ঘিরে রেখেছে। পাশেই সব্জির চাষ। হোটেল থেকে জানানো হলো সকাল দশটার মধ্যে ব্রেকফাস্ট সেরে রেডি থাকতে। আজ লেহ শহর ঘুরে দেখা। সময়ের আগেই গাড়ি এসে গেছে। এবারে আমাদের সঙ্গী জাইলো। চালক একটি কমবয়সী লাদাখি ছেলে। নাম কর্মা।

হিমালয়ের কারাকোরাম পর্বতমালায় ঘেরা এই লাদাখ অঞ্চল, পৃথিবীর উচ্চতম শীতল মরুভূমির দেশ। উইলো, এপ্রিকট, পপলর আর আপেল এই চার রকমের গাছ প্রধানত দেখা যায় এই অংশে। বৃত্তাকারে পাহাড়ে ঘেরা এক বিস্তৃত উপত্যকা লেহ, লাদাখের রাজধানী শহর।

প্রথমে আমাদের গাড়ি গিয়ে দাঁড়ালো "Hall of Fame" এর সামনে। এটি একটি সংগ্রহশালা। লাদাখি রাজবংশের নানা নিদর্শন, লাদাখের মানুষের জীবন বৃত্তান্তের নানা খুঁটিনাটির বিবরণ এখানে সুন্দরভাবে বর্ণিত আছে। এছাড়া চীনের সাথে যুদ্ধে ব্যবহৃত অস্ত্র, ভারতীয় সেনাদের স্মৃতিসৌধ, আর যুদ্ধে ব্যবহৃত কামান, এর প্রধান আকর্ষণ। অপূর্ব এখানকার প্রাকৃতিক শোভা। যেদিকে তাকাই বৃত্তাকারে শুধু পাহাড় নজরে আসে। ওপরে ঝকঝকে নীল আকাশ। চাপ চাপ সাদা মেঘ যেন আটকে আছে তার গায়ে। এর ঠিক পেছনেই লেহ বিমানবন্দর, যেটা পৃথিবীর উচ্চতম বিমানবন্দর।

এর পরের দ্রষ্টব্য শান্তি স্তূপা। জাপানিদের তৈরী বৌদ্ধমন্দির। কিছুটা চড়াই উঠে পৌঁছলাম মন্দিরের সামনে। পরিষ্কার শান্ত পরিবেশ। কিছু বিদেশী পর্যটক চুপচাপ ধ্যানমগ্ন। কোনো কথা নেই কোনো গোলযোগ নেই। আমিও কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকলাম। সত্যিই অপার শান্তি। বাইরে একটা লোমশ কুকুরও পরম নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। পাহাড়ের ওপরে মন্দিরের সামনের অনেকটা অংশ রেলিং দিয়ে ঘেরা। সেখান থেকে নীচে শহরের অনেকটা অংশ সুন্দর দেখা যায়।

ওখান থেকে বেরিয়ে প্রায় তেরো কিমি দূরে থিক্সে মনাস্টরি। সুন্দর সাজানো পাহাড়ি ঘুরপথ পেরিয়ে ওপরে উঠলাম। বুদ্ধের নানা সময়ের মূর্তি আর পোট্রেটে সাজানো। ভক্তরা কোল্ড ড্রিংকস, টাকা ইত্যাদি নানা জিনিস উৎসর্গ করছে। আমূল বাটারের মোমবাতি জ্বলছে মূর্তির পায়ের কাছে। বহু বিদেশি পর্যটকের ভিড়। পাহাড়ের গায়ে গাড়ি রাখার জায়গাটাও অত্যন্ত মনোরম। প্রকৃতি যেন সৌন্দর্য উজাড় করে দিয়েছে।

গাড়ির কাছে এসে দেখি কর্মা গাড়িতে নেই। কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর দেখি ছুটতে ছুটতে আসছে। বেশ বেলা হয়ে গেছে। খিদেও পেয়েছে। তাই সোজা রেষ্টুরেন্টে। চাউমিন আর ফ্রুট জুস দিয়ে লাঞ্চ সেরে দেখি ঠিক তার উল্টো দিকেই "সে মনাস্টরি"। রাস্তা থেকে বেশ উঁচুতে। পাহাড়ের খাঁজে দূর থেকেই দেখলাম। খাঁ খাঁ রোদে এতো চড়াই উৎরাই ভেঙে তখন বেশ ক্লান্ত।

ওখান থেকে লেহ প্যালেস বেশ খানিকটা দূরে। অনেকটা উঁচুতে পাহাড়ের ওপর তৈরি এই প্রাচীন রাজপ্রাসাদটি। উচ্চতায় প্রায় ন'তলার সমান। এমন উঁচু বিল্ডিং পৃথিবীতে সেসময়ে এখানেই প্রথম। তিব্বতের রাজধানী লাসায় পোটালা প্যালেসের অনুকরণে এই প্রাসাদ তৈরি। প্রায় পাঁচশো বছরের পুরোনো। তবে রক্ষণাবেক্ষণের অভাব খুব চোখে পড়ে। প্যালেসের ওপর থেকে লেহ শহরের শোভা অপূর্ব।

এখান থেকে বেরিয়ে এবার হোটেলে ফেরা। চা কফির সাথে একপ্রস্থ আড্ডা। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়েই আবার বেরোলাম। উদ্দেশ্য লেহ মার্কেট। সুন্দর ঝাঁ চকচকে মার্কেট। মার্কেটের শুরুতেই পরপর রঙবেরঙের তিব্বতী গয়নার

দোকান। সেখানেই প্রায় আটকে গেলাম আধ ঘণ্টার ওপর। পেছন থেকে তাগাদা চলছে যথারীতি। এদিক ওদিক ঘুরে কিছু দরকারি কেনাকাটা সেরে ফেরার পথে তিব্বতী "বাটার টি" খেলাম গরম গরম সিঙাড়া সহকারে। বাটার দেওয়া এই চা স্বাদে নোনতা। চিনির বদলে নুন দেওয়া হয়, চায়ের পাতাও চলতি চায়ের পাতা থেকে আলাদা। খেতে বেশ সুস্বাদু। সুবেশা তিব্বতী মহিলারা এই বাটার টি কাপ প্লেটে সাজিয়ে হাসি মুখে পরিবেশন করছে রাস্তার পাশেই বসে।

হোটেলে ফিরে ডিনার সারতে প্রায় দশটা বেজে গেলো। এখানে এসে থেকে বেশিরভাগ সময়েই নিরামিষ খাওয়াদাওয়া চলছিল। ডিম যদিও বা পাওয়া যায় তাও শুধু মাত্র ব্রেকফাস্টে। তবে আজ ডিনারে চিকেন পেয়ে মেয়ে তো যারপরনাই খুশি। খেয়ে ফিরে কিছুটা প্যাকিং সেরে শুয়ে পড়লাম।

পরের দিনের গন্তব্য নুব্রা ভ্যালি। পথে বিশাল উচ্চতা পেরোতে হবে। একটু চিন্তা সে নিয়েও।

পাহাড়ের কোলে রাতের আলো আঁধারিতে পাহাড়ি গোলাপের সুগন্ধে কখন যেন দুচোখের পাতায় ঘুম নেমে এলো.....

গাড়িতে লাগেজ প্যাকিং করে বেরোতে প্রায় দশটা বেজে গেলো। নুব্রা ভ্যালির পথে আজ আরো অনেক উঁচুতে যাওয়া। ব্যাগে পোর্টেবল অক্সিজেন সিলিন্ডার ভরে নিয়ে রওনা দিলাম। হোটেল থেকে বেশি করে জল খাওয়ারও পরামর্শ দিল।

পাহাড়ে ঘেরা সুন্দরী এই লেহ উপত্যকা। সুন্দর প্রশস্ত রাস্তা পেরিয়ে কখন যে পাহাড়ের পাকদণ্ডী পৌঁছে গেছি বুঝতে পারিনি। রুক্ষ পাহাড়ের মাথায় হঠাৎ হঠাৎ বরফের চূড়া। হীরের মতো জ্বলজ্বল করে উঠছে আলো পড়ে। মাঝে মাঝেই পাশ দিয়ে হুস হুস করে চলে যাচ্ছে বাইক আরোহীর দল। লেহ থেকে বাইকে এরা লাদাখ পরিভ্রমণে বেরিয়েছে।

এভাবে প্রায় ঘন্টা দেড়েক যাবার পর এলো খারদুংলা পাস। দুরত্ব লেহ থেকে চল্লিশ কিমি। উচ্চতা প্রায় আঠেরো হাজার ফিট। ভাঙা চোরা রাস্তা, সাথে ঝিরঝিরে বৃষ্টি। অসম্ভব ঠান্ডা হাওয়া চলছে। গাড়ি থামলো বিশ্বের উচ্চতম ক্যাফেটেরিয়ার সামনে। গাড়ি থেকে নেমে দার্জিলিং চা খেয়ে শরীর গরম রাখার চেষ্টা চললো। খারদুংলা পৃথিবীর সর্বোচ্চ গাড়ি যাবার রাস্তাগুলোর একটা । এক অদ্ভুত অনুভব যা বলে বোঝানোর না।

হঠাৎই দেখি ওই অল্প পরিসরে গাড়ির জ্যাম লেগে গেছে। কর্মার থেকে শুনলাম সামনে ল্যান্ড স্লাইডিং হয়েই এই বিপত্তি। যতক্ষণ না রাস্তা ঠিক হয় এভাবেই এখানে দাঁড়িয়ে থাকা। পাশে অপূর্ব প্রকৃতি। বরফ পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে রাস্তা ছুঁয়েছে। দাঁড়িয়ে থাকার একঘেয়েমি অনুভবই হচ্ছেনা।

ওদিকে আর্মির লোক জোরকদমে কাজে নেমে পড়েছে। প্রায় ঘন্টা খানেক পর গাড়ি ছাড়ার অনুমতি মিললো। সুউচ্চ রাস্তা পাহাড়ের বাঁক ঘুরে আস্তে আস্তে মিলিয়ে যেতে লাগলো। বেশ বেলা হয়ে গেছে। রাস্তায় এক জায়গাতে একটা দোকান দেখে দাঁড়ানো হলো। অবাক হয়ে দেখি বাংলায় লেখা নানা খাবারের নাম। এমন দুর্গম জনশূন্য এলাকায় মাতৃভাষা দেখার আনন্দে বিহ্বল তখন। কোল্ড ড্রিংকস, চিপস চকোলেট কিনে আবার চলা শুরু। বেশ কিছু পরে নর্থ পুল্লু পৌঁছে লোকালয় চোখে পড়লো। এখানেই আজ দুপুরের লাঞ্চ।

লাঞ্চের পর আরো ঘন্টা দুয়েক বাদে পৌঁছলাম ডিসকিট মনাস্টরি। অসাধারণ প্রকৃতির মাঝে এই মনাস্টরিটি প্রায় পাঁচশো বছরের পুরোনো। সেখানে পৌঁছে দেখি সাজো সাজো রব। জানা গেলো তার দুদিন পরেই দলাই লামা আসছেন সেখানে। তারই প্রস্তুতিতে ব্যস্ত সবাই। সে ব্যাপারে দেখলাম কর্মাও বেশ উত্তেজিত।

মনাস্টরিটি পাহাড়ের অনেক উঁচুতে অবস্থিত। সেখানে নানা রঙের বিশাল এক মৈত্রেয় বুদ্ধের মূর্তি। উচ্চতায় মূর্তিটি একশো ফুটের বেশী। পাশের নানান রঙের পাহাড়গুলো যেন শিল্পীর তুলিতে আঁকা ছবি। আমাদের মতো তারাও যেন ঘাড় উঁচু করে তাকিয়ে তাঁর দিকে। এখানে দেশী বিদেশী পর্যটকদের বেশ ভিড় চোখে পড়লো।

স্যান্ভিউন্স যাবার পথে কর্মার সাথে গল্প জমে উঠলো। এই নুব্রাতেই কর্মার বাড়ি। কাজের কারণে লেহ্‌তে থাকে মাসতুতো ভায়ের সাথে। ভাই কলেজে পড়ে। কর্মার মা নেই। দাদা দুবাইতে চাকরী করে। বাড়িতে বৌদি বাবা আর ছোট্ট ছেলে নিয়ে থাকে। এতো কাছে এসেও যেতে পারবেনা ভেবে মনটা আমারই খারাপ লাগছিলো।

রুক্ষ পাহাড়ে ঘেরা উপত্যকা চিরে রাস্তা। রাস্তার দু'পাশ পাথুরে। পাথর ক্রমশ বালিতে রূপ নিয়েছে। ভিউ পয়েন্টে গিয়ে গাড়ি দাঁড়ালো। পাহাড়ে ঘেরা দিগন্ত বিস্তৃত বালিয়াড়ি। উট নিয়ে ঘুরে দেখানোর ব্যবস্থা। এখানকার উটের বিশেষত্ব হলো দুটো কুঁজ। রাজস্থানে যে উট দেখা যায় তার কুঁজ একটাই। বহু আগে এই দুই কুঁজ ওয়ালা উট তিব্বত মঙ্গোলিয়া থেকে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে এখানে আসে। তারাই থেকে যায় এবং বংশ বিস্তার করে। আজ তারা সংখ্যায় প্রচুর।

উটে চড়া এক মজার অভিজ্ঞতা। বহু আগে রাজস্থানের স্মৃতি জেগে উঠলো। ভয় ভীতি কাটিয়ে কিছুটা জটায়ুর স্টাইলে উঠেও ভয় যাচ্ছে না। একটি বাচ্চা উট আমাদের পেছন পেছন আসছে। মাকে নিয়ে যাওয়া তার একটুও পছন্দ না। আমার পায়ের কাছে এসে চিঁহি চিঁহি স্বরে তা জানান দিচ্ছে বারবার। রাগ করে কামড়ে না দেয় এই ভেবে আরো ভয় লাগছে। যদিও বিশাল দাঁত তাও এরা কামড়ায় বলে আমার জানা নেই। নিজেকেই নিজে সান্ত্বনা দিচ্ছি এই ভেবে। সামনে অপরূপা প্রকৃতির হাতছানি। বুক দুরদুর করলেও সেদিক থেকে চোখ ফেরাবার সাধ্যি নেই। এই নুব্রা ভ্যালিতে আমাদের টেন্টে থাকার ব্যবস্থা। নাম নুব্রা এস্কেপ। নতুন অভিজ্ঞতা। ভাবতেই বেশ রোমাঞ্চ লাগছে। জায়গা খুঁজে পৌঁছোতে সন্ধে হয়ে গেলো। এই অঞ্চলের নাম হুন্ডার। নতুন ক্যাম্প। মাস খানেক হলো শুরু হয়েছে। চারিদিক পাহাড়ে ঘেরা। ম্যানেজার ছেলেটির ব্যবহার বেশ ভালো। বাংলাও জানে। বিহারের ছেলে, কাজের খাতিরে এখানে আসা। ক্যাম্পের বাইরে খোলা আকাশের নীচে চায়ের বন্দোবস্ত। টি পটে গরম চা কফি সাজিয়ে আমাদের ডাক পড়লো। চায়ের সাথে চললো অন্তাক্ষরী। ফোনের টাওয়ার থেকে শুরু করে ক্যাম্পের নিজস্ব রিভর – কিছুই নেই এখানে। সময় কাটানো শুধু প্রকৃতির সাথে সখ্যতাতে। যা চোখের আর মনের ক্যানভাসে আঁকা থাকবে চিরকাল .....

ক্যাম্পে থাকা বেশ একটা অভিনব ব্যাপার। এখানে রাত আটটা নাগাদ সন্ধে হচ্ছে। আর সাড়ে সাতটা থেকে রাত সাড়ে দশটা পর্যন্ত বৈদ্যুতিক আলোর বন্দোবস্ত। তার মধ্যেই সব সেরে শুয়ে পড়া। ওইটুকু সময়ের মধ্যে সবার ফোন, ক্যামেরার ব্যাটারি চার্জ দেওয়াটাও বেশ মুশকিলের। কিন্তু যস্মিন দেশে যদাচার। রাতের তাঁবুতে একটি করে টিমটিমে

এমার্জেন্সি লাইটের ব্যবস্থা আছে। ভোরে উঠে জিপার লাগানো প্লাস্টিকের দরজা খুলে বাইরে এলাম। একটা মেয়েদের গ্রুপ এসেছে এই ক্যাম্পে। তারা নিজেদের মধ্যে হাসিঠাট্টায় মত্ত। আমাদের চায়ের টেবিলের কাছে আসতে দেখে চেয়ার ছেড়ে দিয়ে উঠে পড়লো। অল্পক্ষণের মধ্যেই চা চলে এলো টেবিলে। একটি মেয়ে মাথা থেকে ওড়না জড়ানো হাতে চায়ের ট্রে নিয়ে নিজের রুমে যাচ্ছিলো। আমাদের মুখে বাংলা কথা শুনে একটু দাঁড়িয়ে পড়েছে। পরিচয় হতে জানলাম কলকাতা থেকে এসেছে। সঙ্গে পতিদেব। নববিবাহিত মুসলিম দম্পতি। লেহ থেকে বাইক ভাড়া নিয়ে নুব্রা হয়ে আজই প্যাঙ্গঙ যাচ্ছে। আমাদেরও বেরোবার তাড়া। গন্তব্য ঐ একই, প্যাঙ্গঙ লেক।

নটা নাগাদ বেরিয়ে পড়লাম আমরা। অপরূপ নিসর্গ। ঝকঝকে নীল আকাশ। এ যাত্রায় আমাদের সঙ্গী সায়ক নদী। সায়কের গা ঘেঁষা রাস্তা। পাহাড়ি ঘুরপথে কখনো খুব কাছে তো কখনো বেশ নীচে সায়কের ঈষৎ সবুজ জলরাশি। ঘন্টা দু'আড়াই যাবার পর টি ব্রেক। সায়ক নদীর গায়ে একটি ছাতার তলায় টি স্টল। জায়গাটির নামও সায়ক। সায়কের উচ্ছল কলতান যেন ধূসর পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে সুর তুলছে। গাড়ি থেকে নেমে দেখি একটি বাইক আরোহীর দলও ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে চা খাচ্ছে। কাছে যেতে বুঝলাম এরা বাঙালি বাইকার্স। কথা বলে জানতে পারলাম এরা নিজেদের বাইক নিয়ে সোজা আন্দুল থেকে এখানে এসেছে। লতায় পাতায় নানা পরিচয়ও বেরিয়ে গেলো। চা খেতে খেতে তারা তাদের নানান রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার গল্প শোনাচ্ছিলো। মন না চাইলেও উঠতেই হলো। অনেক পথ যে বাকি। ওরাও আজ একই পথের পথিক।

বাইকার্সদের বিদায় জানিয়ে আবার চলা শুরু করলাম। প্রকৃতির এই রুক্ষ সৌন্দর্য এতোদিনে বেশ চোখ সয়ে গেছে। রুক্ষ পাহাড়ের কোলে নানান পাহাড়ি নদীর সুরেলা জলতরঙ্গ আমাদের সফরসঙ্গী। কখন বেলা গড়িয়ে গেছে টেরই পাইনি।

পথে এক জায়গায় এক বয়স্ক স্থানীয় মহিলার হাতের ডিম টোস্ট চাউমিন দিয়ে লাঞ্চ সারা হলো। মহিলার মুখে লাগানো মিষ্টি হাসি। সুন্দর আপ্যায়ন। ঘরেই রান্নাবান্নার ব্যবস্থা, বাইরে রঙিন টেন্টের মতো ছাউনি ঘেরা জায়গায় খাবার বন্দোবস্ত। লাঞ্চ সেরে আবার যাত্রা শুরু। চলেছি প্যাঙ্গঙের উদ্দেশ্যে। পথে এক জায়গায় গিয়ে গাড়ি দাঁড়ালো। এটি একটি মহিলা সেনা পরিচালিত চেশপোস্ট। জায়গাটি বেশ প্রশস্ত। রাস্তা হাল্কা ডাইনে ঘুরে সোজা চলে গেছে। কর্মা গেলো কাগজপত্র দেখাতে। আমরা মুগ্ধ হয়ে প্রকৃতি দেখছি। মেয়ে ছবি তুলছিলো ওর মোবাইলে। হঠাৎই একজন এসে ওই ছবিগুলো ডিলিট করতে বলে। বাধ্য হয়ে করতে হলো তার উপস্থিতিতেই। কর্মার থেকে জানলাম ওখানে ভারতীয় সেনার বাঙ্কার আছে। দেখলাম পাহাড়ের কিছুটা উঁচুতে বাঙ্কার গুলো। দূর থেকে কিছু বোঝার উপায় নেই। চলেছি চীনের সীমান্ত অভিমুখে। তাই সুরক্ষার কারণেই এই কড়া নিষেধাজ্ঞা। কিছুদূর গিয়ে দেখি অনেকগুলো গাড়ি দাঁড়িয়ে। পাশে পাহাড়ের কোলে কিছুটা সমতল। সেখানে বেশ ভিড়। আমরাও নামলাম। একটি মার্মট নানা ভাবে সুর তুলেছে গলায়। সাথে সুন্দর অঙ্গভঙ্গী। এটি এই অঞ্চলের বিশেষ একপ্রকার প্রাণী। কাঠবিড়ালীর জাত ভাই। আকারে যদিও অনেক বড়ো। দুর্লভ ও বটে। এতো মানুষের ভিড়ে বেচারা বেশ ঘাবড়ে গেছে। এক একবার মাটির তলায় সুড়ঙ্গে লুকিয়ে পড়ে, আবার উঠে আসে। কর্মা আমাদের সাবধান

করে দিলো কিছু খেতে না দিতে। মানুষ না বুঝে কেক বিস্কুট খেতে দেয়। যা থেকে ওদের জীবন সংশয় হতে পারে। মার্মটকে এমন খোশ মেজাজে দেখতে পেয়ে নিজেদেরকে বেশ ভাগ্যবান বলে মনে হচ্ছিল সেদিন।

নুব্রা থেকে রওনা দিয়ে খালসার, আঘম, সায়ক, দুরবুক, তাংসে পার হয়ে গাড়ি চলেছে প্যাঙ্গঙ অভিমুখে। প্রাণহীন রুক্ষ পাহাড়েরও কি রূপ বৈচিত্র্য ! এক জায়গায় দেখি ধূসর পাহাড়ের পা ছুঁয়ে উঠেছে ছাই-কালো রঙের একটি পাহাড়। দুই পাহাড় যেন সূক্ষ্ম কোণে মিলিত হয়েছে। নীল আকাশের ক্যানভাসে আঁকা হাত ধরাধরি করা দুই পাহাড়ের এমন রঙের বৈপরীত্য চোখে না দেখলে বোঝা সম্ভব না।

দেখতে দেখতে গাড়ি এখন প্যাঙ্গঙের বেশ কাছে। লেকের নামে একটি রেষ্টুরেন্ট দেখে বুঝলাম আকর্ষণের কেন্দ্র বিন্দুর কাছেই পৌঁছে গেছি আমরা। ভেতরে এক চাপা উত্তেজনা। থ্রি ইডিয়েটস্ এর লাস্ট সিনটা তখন চোখে ভাসছে। এরই মধ্যে দু একটা নীল জলের হ্রদ পেরিয়ে এসেছি। তার সিনিক বিউটিও অপূর্ব। হঠাৎই দুই পাহাড়ের খাঁজের ভেতর দিয়ে দেখা দিলো প্যাঙ্গঙ। মনটা কেমন যেন নেচে উঠলো। সত্যিই তাহলে পৌঁছে গেলাম চোদ্দহাজার ফুট উঁচুতে এই স্বর্গীয় সুন্দর লেকের সামনে ! পাহাড়ের বাঁক ঘুরে সামনে এসে যখন গাড়ি দাঁড়ালো, নামার কথা যেন ভুলেই গেছি। রাস্তা থেকে কিছুটা নীচে ধূসর পাহাড়ের কোলে যতদূর চোখ যায় ঘন নীলের সমারোহ। গাড়িতে বসেই অবাক হয়ে দেখছি তার মোহময়ী রূপ..... আহা.....

(চলবে)

মৌসুমী রায় – সেবায় ও পালনে, শুশ্রূষা ও পরিচর্যায় ব্যস্ত গৃহবধূ। যৎসামান্য অবকাশের আকাশে রামধনুর খোঁজ, কবিতা লেখায়, সাহিত্য পাঠে। পাঠকের সাথে ভাগ করে নিয়েছেন তাঁর লাদাখ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা। উপরি পাওনা প্রাঞ্জল গদ্য আর কিছু নয়নাভিরাম ছবি।

বিশ্বদীপ চক্রবর্তী

তিন শালিখ

প্রথম অঙ্ক

(কাজিও ইশিগুরোর গল্প অবলম্বনে)

(মঞ্চে তিনটি চরিত্র – পূর্ণ, অমলা আর চঞ্চল – সবার বয়স মধ্য চল্লিশ। আলো এক একবার একেজনের উপরে পড়ছে, তখন অন্যরা আধো অন্ধকারে। মঞ্চের এক কোনায় আলো পড়ে। কিছু জামা কাপড় পড়ে আছে, সুটকেসে গুছিয়ে তুলছে পূর্ণ। অমলা ডেস্কে বসে কাজ করছে। চঞ্চল সোফায় বসে টিভি দেখছে)

পূর্ণ – (গান গাইছে, 'কোথাও আমার হারিয়ে যাবার নেই মানা, মনে মনে', জোরে থেকে আস্তে হয়ে গুন গুন করে) ব্যাস চললাম হারাতে, দিল্লী। গরমের ছুটিতে দিল্লী শুনে অবাক হচ্ছেন নাকি ? আহা বাবা, টুরিস্ট প্লেস হিসাবে কি আর যাচ্ছি ? চঞ্চল আর অমলা থাকে যে ওখানে। কবে থেকে লিখছে, যাওয়াই হয় না। চঞ্চল এবার আর ছাড়ল না।

অমলা – উফ, আবার আসছে পূর্ণটা। নিজের কাজে জেরবার হচ্ছি, ভাল লাগে না কি বাড়িতে ঘাড়ের উপর কেউ বসে থাকলে? আমার সহ্য হয় না। দায়িত্বহীন, উদ্দেশ্যবিহীন জীবন! কি একটা লাইফ? স্কুলমাস্টার! স্কুলে পড়ান খারাপ তা নয়। পড়াও স্কুলে, যদি পড়াতে অত ভালবাস। কিন্তু দুন স্কুলে পড়াও, নিদেন সেন্ট জেভিয়ার্স বা তেমন কিছু। তা নয়, কোন মফস্বলের স্কুলে শহর থেকে দুড়ে পরে আছে।

চঞ্চল – সেটা পূর্ণকে কে বোঝাবে ? যখন আমরা সবাই জীবনটাকে সাজিয়ে গুছিয়ে তোলার জন্য ব্যস্ত, তখন কোথায় পূর্ণ ? কত রকমের হুজুগে যে মাতল। আজ পাহাড় চড়ছে তো কাল বন্যা ত্রানের কান্ডারী। আরে বাবা পহেলে আপ জিও, বাদ মে এন জি ও।

অমলা – আসলে বাহানা। কেন রে বাবা, কিসের থেকে পালাচ্ছো ? জীবন থেকে, এগিয়ে যাওয়া থেকে ? বুড়োখোকা !

চঞ্চল – কিছু বললে মিটি মিটি হাসবে । শুধু অমলার কাছেই জব্দ ।

অমলা – কোথায় আর ? জিজ্ঞেস করেছিলাম – কেন ব্যাঙ্কিং পরীক্ষায় বসলে না তুমি ? ফর্ম তো ভরালাম তোমাকে দিয়ে । মাথা চুলকে বলেছে – কি করব অযোধ্যা পাহাড়ের ট্রিপটা তখনি হল যে। শুনলে রাগ হয় না ? পাহাড় কি তোমার পালিয়ে যাচ্ছিল? নিজের জীবনটা নিয়ে একবার ভাববে না ?

(মঞ্চের আলো সরে যায় আর এক কোনায়, পূর্ণ বসে)

পূর্ণ – আমরা কেউ মাস্টার হতে চেয়েছিলাম, কেউ ডাক্তার, কেউ উকিল। অমলকান্তি সে সব কিছু হতে চায়নি। সে রোদ্দুর হতে চেয়েছিল। ক্ষান্ত বর্ষণ কাকা-ডাকা বিকেলের সেই লাজুক রোদ্দুর, জাম আর জামরুলের পাতায় যা নাকি অল্প একটু হাসির মতন লেগে থাকে। আমরা কেউ মাস্টার হয়েছি, কেউ ডাক্তার, কেউ উকিল। অমলকান্তি রোদ্দুর হতে পারে নি।

চঞ্চল – কাঁধে ঝোলা, মুখে কবিতা আর এমলেস লাইফ। বেঙ্গলের আজ এই দশা কেন? পূর্ণর মতন ছেলেদের জন্য। বুদ্ধিশুদ্ধির অভাব ছিল না, অভাব চেষ্টা – মেয়ে পটাতে কবিতা আউড়ালি, গান গাইলি – অথচ জমিয়ে একটা প্রেম তো করতে পারলি না।

পূর্ণ – জীবনটা যার যার তার তার। যে যা ভালবাসে। যে যাকে ভালবাসে। যেমন চঞ্চল আর অমলার প্রেম। তা স্বত্বেও ছেলেরা অমলার চারপাশে পাক মারাটা কি সহজে ছেড়েছিল ? ও ছিল কলেজের ফেমে ফ্যাটাল।

অমলা – ছেলেদের ঘুরঘুর আমার ভাল লাগত না। সেই জন্যেই তো আমি আরও বেশি বেশি করে চঞ্চলের দিকে ঝুঁকে পড়েছিলাম। চঞ্চল ছিল আমার বডিগার্ড। (হাসি) আরে না না, এরকম নয় যে আমি চঞ্চলকে ইউজ করছিলাম বা আর কিছু। ওকে আমি ভালবাসতাম। খুব।

চঞ্চল – অমলার ভালবাসায় চাওয়ার জোরটা ছিল খুব। কলেজে খুব ভাল লাগত সেটা, কেউ আমার সবকিছুর দেখাশোনার দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছে। নিজেকে খুব ইম্পরট্যান্ট মনে হয় না ? কিন্তু আর কদিন ভাল লাগে ? ডু আই রিয়ালি নীড আ পার্সোনাল প্ল্যানার ফাইন্ডিং ফল্ট উইথ এভ্রি লিটল থিং?

অমলা – আমার ভালবাসাটা না সবসময়েই ওরকম। ঘন। বেশী বেশী, শীতের রাতে জুড়িমুড়ি করে কম্বল চাপা দিয়ে বসার মত। মা ছোটবেলায় বলতো তুই খুব গলা জড়ানো মেয়ে আমু, সবাই কিন্তু এত জড়ানো পছন্দ করে না । চিন্তা হয়। (নিস্তব্ধ) মা অবশ্য অত চিন্তা করার সময় পায় নি আর, আমি ক্লাস নাইনে উঠতে না উঠতেই –

পূর্ণ – অমলার মা খুব ভাল গান গাইত, বেশ নাম ছিল। স্কুলে থাকতে থাকতে মাকে হারিয়ে, মায়ের ভাল লাগার গানকে আরও বেশী আঁকড়ে ধরেছিল। অমলা নিজে অত ভাল গাইত না, কিন্তু শুনত। চঞ্চল আমার বন্ধু হলেও, গানের দৌলতে অমলার সাথে আমার খুব জমে যায়।

অমলা – কি সুন্দর গলা ছিল ছেলেটার! গান, কবিতা। ভাল কত বিষন্ন বিকেলে ওর মুখে গান শুনতে শুনতে সন্ধ্যা নেমেছে। মার প্রিয় গানগুলো ওর মুখে শুনেছি। ঝগড়াও করেছি। কিভাবে সেসব সময় কেটে গেছে।

চঞ্চল – কোন বাঙ্গালিটা কবি নয়? আরে বাইরে সুন্দর বিকেল, এনজয় দ্য এভনিং, গো রক এন্ড রোল, তা না শুধু সেই দাড়িওলার গান। কিন্তু কে কাকে বোঝাবে? সবাই তখন ক্যাসেটে ম্যাডোনা শুনছে, জ্যাকসন শুনছে। আর কিছু না হোক ব্যান্ডের গান শুনচে। আর ওরা মান্ধাতার আমলের রেকর্ড চাপিয়ে প্যা প্যাঁ করছ।

অমলা – সবাই না হয় ম্যাডোনা শুনছে, তুমি কি শুনছ বল তো? শুধু যে ওর গলা ছিল না তা নয়, কানও ছিল না। আমি তো ওকে কক্ষনো নিজে থেকে গান শুনতে দেখিনি। আমার সঙ্গে মাঝে মাঝে গান শোনার ভান করেছে। আমি ঠিক ধরে ফেলতাম। জিজ্ঞেস করতাম কি গান শুনলে বলতো? কয়েক বার ধরা পড়ে যাবার পরে আর সে চেষ্টা করে নি।

চঞ্চল – গান আমি অত বুঝতাম না, তবু প্রথম প্রথম ওর সঙ্গে বসে শুনেছি। কিন্তু সমঝদার কি করে হয়ে যাবো? আমি পূর্ণ হতে পারবো না। তবে একটা সময়ের পর থেকে আমাদের মধ্যে একটা অলিখিত চুক্তি হয়ে গেছিল যে আমি গান শোনার বাহানা করব না, আর ওকেও আমার সঙ্গে ক্রিকেট খেলা দেখতে হবে না। পূর্ণই ছিল ওর গান শোনার সঙ্গী। মেনে নিয়েছিলাম।

পূর্ণ – চঞ্চল মুখে কিছু না বললেও বেজার হত। না না, কোন সন্দেহ নিয়ে নয়। আসলে অমলার এই একটা দিক ওর নাগালের বাইরে ছিল, সেটাই ওর খারাপ লাগত। গান শুনতে শুনতে আর গাইতে গাইতে আমরা আরও কত কথা বলতাম। মেনলি ওর মায়ের কথা।

অমলা – পূর্ণর জন্য চঞ্চলের সঙ্গে আমার সম্পর্কের কোন বিপদ হয় নি। হতে পারত, পারত না তা নয়। কারণ ও আমার সেই জায়গাটা ছুঁতে পারত, চঞ্চল যার ধারে কাছেও ছিল না। তবু মনে হয় নি। কারণ কোন কিছু নিজের করে চাইবার ছেলে পুর্ণ ছিল না। নোঙ্গর বাঁধার জন্য উপযুক্ত হয়ে ওঠে নি ও কোনদিন।

পূর্ণ – চঞ্চল এতটাই বেসুরো ছিল যে বাথরুমেও গাইতে সাহস পেতো না। তাতে কিছু এসে যায় না, জীবনের আসল জায়গাগুলোয় চঞ্চল ঠিকঠাক গোল করে বেরিয়ে যাচ্ছিল।

অমলা – কলেজে অবশ্য এতটা ছিল না। কিন্তু কলেজের পর ও কেন যে এত কিছু থাকতে স্কুলে চাকরি নিল? কলকাতা থেকে দূরে, ধ্যাদ্দেরে গোবিন্দপুরে। বিয়েও তো করল না, ঠিক কেন যে করল না সেটা কোনদিন ভেঙ্গেও তো বলে নি। ঝগড়া করেছি খুব।

চঞ্চল – শেষ অবধি অমলাও ছেড়ে দিয়েছিল। আমাদের সংসার বসানোর ছিল, জীবনে কিছু করার ছিল। আমি তখন সেলসের চাকরিতে, খুব ছোটাছুটি। শুধু সেলসের টার্গেটে পৌঁছানো না, অমলার কন্ডিশন ছিল সেলস ম্যানকে ও বিয়েই

করবে না। বিয়ে করতে হলে আগে রিজিওনাল সেলস ম্যানেজার হতে হবে। আমি পাঁচ বছরের মধ্যে তিনটে চাকরি বদলে এক্সাইডে রিজিওনাল সেলস ম্যানেজার। ততদিনে অমলা চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট, মাল্টি ন্যাশানালে ভাল পোস্ট। পূর্ণটা কি করে এসব থেকে ফাঁকতালে পিছলে গেল ।

পূর্ণ – একেক জনের জীবন একেকভাবে কাটে। মজা থাকতো সব একরকম হলে? কেউ এগোলে, কাউকে তো পিছনে সরতেই হবে, তাই না। আসলে যারা পিছনে পরে যায়, তাদের মুখটা শুকোলে, হা হুতাশ থাকলে সবাই নিশ্চিন্তে থাকে যে জীবনটা ঠিকঠাক চলছে। কিন্তু পিছনটা যে পেছন দিয়ে সামনে, যে সেটা বুঝে নিয়েছে তার মুখ শুকনো হবে কেন?

অমলা – আমার রাগ হত, ওর একমুখ দাড়ি ভরা হাসি মুখ দেখে। মনে হত, ও যেন আমাদের সুন্দর করে বানান জীবনটাকে উপহাস করছে, তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিচ্ছে। অথচ কি করেছ নিজের জীবনে? কি করতে পারতে, আর কতটুকু করেছো।

চঞ্চল – আমরা আমাদের দৌড়ে ব্যাস্ত ছিলাম, খেয়াল করিনি। আমাদের বিয়েতে এল । হাব ভাব এরকম যেন কলেজেই আছে। মুখের দাড়িটা নেহাত কচি ছিল না। একমুখ দাড়ি, অমলা রেগে কাঁই।

অমলা – বললাম, তুমি কি এবার কোন পলিটিক্যাল পার্টিতে নাম লিখিয়েছো নাকি? যাও, এক্ষুনি কেটে আসো। শুনে মুখ কাচুমাচু।

চঞ্চল – অমলার সামনে ওর কোন জারিজুরি খাটত না। শেষমেশ এই সরকারি স্কুলে চাকরি জোটাল । কিন্তু সেটা কি একটা বলার মত চাকরি?

পূর্ণ – সবাই সব কিছু চাইলেই কি পাবে? হা হুতাশ করে কি লাভ? ওরা তো চেয়েছিল একটা বড় সংসার। হল ? দুজনে বড় চাকরি করে, সাজানো সংসার। কিন্তু বাচ্চা হল না, মানে এখনও তো হয় নি। এটা ভুলতে ওরা আরও বেশী কাজে ঝুঁকে পড়েছে। আরও উন্নতি করেছে। আরও সংসার সাজিয়েছে।

চঞ্চল – অমলা এটা এখনো মেনে নিতে পারে নি। সব কিছু হিসেব করে এগোচ্ছিলাম আমরা। বিয়ের পরে পরেই বাচ্চা চায় নি ও। বলতো আগে একটা মিনিমাম ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স হোক, নিজেদের বাড়ি, গাড়ি। একটা প্রাণকে আনার জন্য সব সরঞ্জাম। সেসব করতে বেশ কটা বছর কেটে গেল, কিন্তু তারপরই হিসেবে গোলমাল। আগে থেকে ভাবলে হয়তো ভাল হত, ডাক্তার বললেন মায়ের লাইফ রিস্ক হতে পারে –

পূর্ণ – সময় তো চলেই যায়। হঠাত দেখি আমি চল্লিশ পেরিয়ে গেছি। কম বয়সটা একরকম ছিল, তখন বন্ধু বানানোও সোজা ছিল। কত জায়গায় যেতাম, তাতেই কত রকমের বন্ধু হত। আর মনে হত আমি যেন পৃথিবী জোড়া এক বিশাল কান্ডের সঙ্গে জুড়ে গেছি।

অমলা – কাজ নেই তো খই ভাঁজ! পূর্ণ সেটাই করে গেছে সারা জীবন। নো ক্লিয়ার অবজেক্টিভ, নো গোল ইন লাইফ! কি ভাবে এক সময় ওর সাথে এত সময় কাটিয়েছি, কে জানে! আমার মনে হয় ওর জীবনের নোঙ্গর ধরার জন্য কারুর দরকার ছিল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাহলে এভাবে ভেসে যেতো না।

পূর্ণ – তখন ভাবতাম যে সব সময়েই বুঝি এরকম ভেসে বেড়াতে পারব। কিন্তু একদিন হঠাত দেখলাম চারপাশে যারা ছিল তারা কখন সব বদলে গেছে। সবার মধ্যে থেকেও একটা নিঃসঙ্গতা। বোঝাতে পারছি না ঠিক, কিন্তু কিছু একটা হারিয়ে যাওয়ার দুঃখ যেন আমাকে ঘিরে ধরেছে বেশ কিছুদিন ধরে। তখন ভরসা এই চঞ্চল আর অমলা ।

চঞ্চল – আমরা তো কলকাতা ছেড়ে কখনো আমেদাবাদ, কখনো বম্বে, আর এখন দিল্লি। ওদিকে পূর্ণ কখনো বিষ্টুপুর, কখনো মসলন্দপুর কিংবা কাটোয়া। তবে হ্যাঁ, আমাদের যোগাযোগটা কিন্তু ছিল। ফেসবুক, মোবাইল না থাকার যুগেও। কলকাতায় আসলে পূর্ণ ঠিক এসে দেখা করত। আর কয়েক বছর পর পর এসে থেকেও গেছে আমাদের বাড়িতে। বম্বেতে, আমেদাবাদে ।

পূর্ণ – আমার জন্য পুরো একটা ঘর সাজিয়ে রেখে দেয় অমলা। কি থাকে না সে ঘরে, ঠিক যেন হোটেল। এই যে সেবার, আহমেদাবাদে ওদের বাড়িতে ছিলাম। শুধু পরিপাটি করে সাজানো ঘর নয়, আমার জন্য অমলা একটা সাউন্ড সিস্টেমও রেখেছিল ঘরে, জানে তো গান শুনতে ভালবাসি। সঙ্গে সব আমার প্রিয় গানের সিডি রাখা ।

অমলা – বয়ে গেছে আমার। অনেক হয়েছে, আর নয়। ঘাড়ের উপর বসে বাউন্ডুলেপনা করতে দেবো না আর। যেমন চঞ্চল, তেমনি তার বন্ধু!

চঞ্চল – পূর্ণ তো আমাদের দুজনেরই বন্ধু! তাই ওর এবার আসাটা খুব দরকার, খুব। আমি তো বারবার করে বলেছি আসতে।

পূর্ণ – নিজের জন্য এমন একটা জায়গা আছে ভাবলেই মন ভাল হয়ে যায়। তাই তো বলছি, এমন একটা বেড়াতে যাওয়ার জায়গা থাকলে অন্য কোথাও যাবার উপায় আছে ?

(স্টেজ পুরো আলোকিত হয়, চঞ্চল পূর্ণর দিকে এগিয়ে আসে)

চঞ্চল – আয়, আয়, ভেতরে আয়। এত দেরী হল কেন? (একটু থেমে) একি রে, বেশ রোগা হয়ে গেছিস দেখছি। কি করে পারিস গুরু, আমরা তো ওয়েট কিভাবে লুজ করবো শুধু সেই ভাবনায় থাকি ।

পূর্ণ – এটা রিলেটিভ ব্যাপারও হতে পারে। আসলে আমি হয়তো একই আছি, আর তুই আসলে মোটা হয়েছিস। শেষবার যে দেখা হল, বছর তিনেক হবে– ওইতো সেবার আমেদাবাদে রে। আমার তো মনে হচ্ছে তখনকার তুলনায় তুইই বহরে বেশ বেড়ে উঠেছিস। অবশ্য তোরটা বুঝি। অমলা আর ওর জিভে জল আনা রান্না। তা তোকে মোটা করার সে কারিগরটি কোথায়?

চঞ্চল – (দীর্ঘশ্বাস) যা বাইরে থেকে দেখা যায় সেটা সবসময়ে বিশ্বাস করা ঠিক নারে পূর্ণ । এটা জাঙ্ক ফুডের এফেক্ট। না রে, অমলা বাড়ি নেই, পারল না। আজ ওর অফিসে কিছু ইম্পর্ট্যান্ট মিটিং আছে, কোন আউট-স্টেশন বস এসেছে। তাই থাকতে পারল না।

পূর্ণ – ও, তাই নাকি?

চঞ্চল – এত দুঃখ পাওয়ার কিছু নেই। তোর বন্ধু আগে আমি, ও নয়। সেটা মনে রাখবি।

পূর্ণ – এতগুলো বছরের পর কি আর কে আগে আর কে পরে, তার ঠিক থাকে রে। বল, আমার সুটকেস কোথায় নামাই।

চঞ্চল – চল, তোর ঘরটা দেখিয়ে দিই।

(চঞ্চল পূর্ণকে ওর ঘরে নিয়ে যায় । ঘরটা যথেষ্ট অগোছাল হয়ে আছে, এখানে ওখানে জিনিস ছড়ান, পূর্ণ অবাক হয়ে চঞ্চলের দিকে তাকায়)

এমনভাবে দেখার কি আছে । হোটেলের ম্যানেজারকে তলব করবি নাকি ঘর পরিস্কার করা হয়নি বলে?

পূর্ণ – না, না তা কেন। আমার এমন অভ্যাস আছে। আসলে তোদের এখানে কক্ষনো এরকম দেখিনি তো। সেটাই মিলছিল না। অমলা তো জানে আমি আসছি, তাই না রে ?

চঞ্চল – জানি, জানি, ইটস আ মেস, সিয়ার মেস। আসলে কাজের লোকটা এসেছিল। কিন্তু অমলা না থাকায় – ওকে দিয়ে কিভাবে কাজ করিয়ে নিতে হয়, আমার সেটা ঠিক আসে না। আমি বলে দিয়েছিলাম, ভেবেছিলাম করে গেছে। কিন্তু এখন দ্যাখ অবস্থাটা ।

পূর্ণ – ঠিক আছে রে, অত ভাবিস না। আমি ঠিক করে নেব না হয়।

চঞ্চল – ওসব কিচ্ছু করতে হবে না তোকে। তার চেয়ে বরঞ্চ লাঞ্চটা সেরে নিই চল। আমি সব ফোন করে হোম ডেলিভারি আনিয়ে রেখেছি। বিয়ার আর কাবাব লাঞ্চ, একটু সময় নিয়ে কথা বলা যাবে। একটু ফ্রেশ হয়ে নিতে চাস যদি, অ্যাটাচড বাথটা ইউজ করতে পারিস।

পূর্ণ – ঠিক আছে, স্নান করব না এখন, শুধু মুখে চোখে একটু জল – আমাকে পাঁচটা মিনিট সময় দে, আমি এখুনি আসছি ।

(চঞ্চল বেরিয়ে যায় । একা ঘরে পূর্ণ নিজের মনে মাথা নাড়তে নাড়তে সুটকেস খুলে জামা কাপড় বের করে অন্য দিকে বেরিয়ে যায় । চঞ্চল ফিরে আসে, হাতে প্লাস্টিকের প্যাকেটে খাবার, বিয়ারের বোতল, থালা, গ্লাস। সব নিয়ে স্টেজের অন্য কোনায় রাখা টেবিলে খাবার সাজাতে থাকে। সাজিয়ে একটা চেয়ার নিয়ে বসে। পূর্ণ জামা কাপড় বদলে মুখ মুছতে মুছতে ফেরত আসে।)

চঞ্চল – বেশ তাড়াতাড়ি করে ফেলেছিস দেখছি।

পূর্ণ – হ্যাঁ আর কতক্ষণ? কিন্তু বেশ ফ্রেশ লাগছে এবারে।

চঞ্চল – আয় বীয়ারের গ্লাসে দুটো চুমুক দে, আরও ফ্রেশ লাগবে। (*দুজনে গ্লাসে চুমুক দেয়। কিছুক্ষণ চুপচাপ*)

চঞ্চল – (গলা খাঁকারি দিয়ে) দ্যাখ, তোকে কিছু বলার আছে আমার । আসলে একটা ব্যাপারে আমি তোর হেল্প চাই, খুব দরকার।

পূর্ণ – বলে ফেল চঞ্চল, এটা নিয়ে এতো কিন্তু কিন্তু করার কী আছে? সব সময়ে তোরাই তো আমাকে সাহায্য করিস, এবার না হয় আমি করবো। বল না।

চঞ্চল – (একটু সময় নেয়) আসলে হয়তো কিছুটা আঁচ করতে পারছিস। কিংবা ইভেঞ্চুয়ালি পারবি। ব্যাপার হল, আমি আর অমলা একটু বাজে সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। শুধু তোকে বলেই বলছি – আমাদের সম্পর্কটা না একটু টাইট যাচ্ছে। মানে কাছাকাছি হলেই ঠোকাঠুকি চলেছে, একজন অন্যজনকে স্ট্যান্ড করতে পারছি না। তাই একজন আরেকজনকে যতটা পারি অ্যাভয়েড করছি। সেই জন্যেই আজ সকালে অমলাকে বাড়িতে দেখতে পাস নি তুই।

অমল – যাব্বাবা কেন রে?

চঞ্চল – সত্যি বলতে কি, এখন, তুই অ্যাট আ টাইম আমাদের একজনকেই পাবি, দুজনকে নয়। হয় না অনেক নাটকে একই লোক দুটো পার্ট করছে, একসঙ্গে ওই দুটো রোল তাই মঞ্চে থাকবে না কক্ষনো। আমাদেরও তাই। হয় আমি আছি, না হয় অমলা। কি, বাচ্চাদের মত মনে হচ্ছে? গুরু, বিয়ে থা করলে না তো, দাম্পত্যের এসব গূঢ় তত্ত্ব কি ভাবে বুঝবে?

পূর্ণ – হুম, এবার বুঝলাম। আমারও কেমন অদ্ভুত লাগছিল। এতদিন বাদে আসছি, আর অমলা কেমন কেটে পড়েছে। ওকে নো প্রবলেম! এরকম তো হতেই পারে। বিয়ে না করলে কি হবে, চারপাশে বিবাহিত লোকেদের দেখি না কি?

চঞ্চল – সেইজন্যেই তো বলছি, তোর হেল্প চাই।

পূর্ণ – একদম। বুঝি তো। হানিমুনেও যেমন তৃতীয় ব্যাক্তি কাবাব মে হাড্ডি, চন্দ্রগ্রহনের সময়েও থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বারদের উপস্থিতি ঠিক নয়। লাঞ্চের পর আমি জিনিস পত্র নিয়ে বেরিয়ে যাবো, কদিন কোন হোটেলে থেকে না হয় –

চঞ্চল – এটা কি বলছিস তুই? তুই চলে গেলে কিভাবে হবে। শুনিস নি আমি কি বললাম। আই নীড আ ফেভার ফ্রম ইউ, আ হেল্প। হেল্প মী লাইক আ রিয়াল ফ্রেন্ড।

পূর্ণ – আমি ভাবলাম তুই আমাকে চলে যেতে বলছিস, মুখে বলতে বাঁধছে তাই কিন্তু কিন্তু করছিস তুই –

চঞ্চল – ইডিয়েট, তাই কি বলেছি নাকি? আই অ্যাম দ্য ওয়ান হু উইল লীভ –

পূর্ণ – মানে, তুই অমলাকে ছেড়ে চলে যাবি? কি বলছিস কি চঞ্চল, এমন কি হয়েছে তোদের?

চঞ্চল – আবার! ডোন্ট জাম্প ইন্টু কনক্লুসন। আমি কি একেবারে চলে যাবো নাকি? আজ লাঞ্চের পর বেরোব। অফিসের কাজে দুদিন বম্বে থাকব, খুব বেশি হলে তিনদিন। ইন দ্য মীন টাইম তুই এখানে থাকবি। অমলা তোর সঙ্গে দুদিন থাকুক, গল্প কর, আড্ডা মার, বেড়াতে বেরো। আমি থিয়েটারের টিকেট কেটে রেখেছি কালকের, দেখে আয়। আমি ফিরে আসলে তিনজনে মিলে টাইম স্পেন্ড করা যাবে। বাই দ্যাট টাইম আই অ্যাম সিওর, সব ঠিক হয়ে যাবে। যেন কখনো কিচ্ছু হয় নি।

পূর্ণ – কি করে সেটা হয়ে যাবে আমি তো কিচ্ছু বুঝতে পারছি না।

চঞ্চল – আগে তোর কথা বল তো, তোর মাস্টারি কেমন চলছে?

পূর্ণ – অ্যাজ ইউজুয়াল । সেই পড়ানো, টিচারদের পলিটিক্স, কে কত ব্যাচ পড়াচ্ছে সেই নিয়ে কপচানি, কবে নতুন পে রিভিশন আসবে সেই দিকে চেয়ে বসে থাকা ।

চঞ্চল – আর তোর পাহাড়?

পূর্ণ – এখন পাহাড় ছেড়ে আহারে মন দিয়েছি । হ্যাঁরে হ্যাঁ, আমি আজকাল দারুন রান্না করছি। ভাবতে পারবি না, আমি কিভাবে চল্লিশ জনের খাবার একা হাতে রান্না করেছি আমার ছাত্রদের জন্য, অ্যাজ দেয়ার সেন্ড অফ ট্রীট । শুনবি কি কি রান্না করেছিলাম – বিরিয়ানি, মাটন কষা –

চঞ্চল – নিজেকে ভুলিয়ে রাখার এইসব চেষ্টা ছাড় । কিছু একটা কর, কতদিন এরকম শহর ছেড়ে দূরে পড়ে থাকবি? ইংলিশের টিচার তুই, স্কুলেই কেন পড়াতে হবে? আমার এক বন্ধু, স্টাফিং-এর বিজনেস আছে ওর। চায়নায় খুব ইংলিশ শেখার ধুম লেগেছে, টীচার চাই। অ্যাপ্লাই করে দে, আমি একবার বললেই হয়ে যাবে ।

পূর্ণ – ঠিক আছে, করবো না হয়।

চঞ্চল – না, না এরকম উড়িয়ে দিলে চলবে না। আমি তোকে চিনি। একবার ফেরত গেলেই আবার সব ভুলে যাবি । তুই এখানে থাকতে থাকতেই অ্যাপ্লাই করবি। বলছি তুই কি করবি – এক নম্বর – রিসিউমটা ঠিকঠাক করে বানা । সেটা আবার আছে তো নাকি? দুই নম্বর – না। আমি জানি তুই এসব কিছুই করবি না ।

পূর্ণ – না, না কেন করবো না । তুই তো ঠিকই বলছিস, ভেরি গুড আইডিয়া।

চঞ্চল – একদম না। আমি জানি তুই এখন মাথা নাড়বি আমার সব কথায়। তারপর নিজের আস্তানায় ফিরে যাবি আর সব ভুলে যাবি। কয়েক বছর পরে আবার দেখা হবে, দেখবো সব যে কে সেই।

পূর্ণ – কেন এভাবে ভাবছিস?

চঞ্চল – পূর্ণ, আমি তোকে আগপাশতলা চিনি বলেই এভাবে ভাবছি। তুই যে কি চীজ, একেবারে গেঁড়ে বসেছিস। বাট ইউ হ্যাভ টু চেঞ্জ। দ্যাখ একটা সময়ে নিজেকে নিজের জীবনের চার্জ নিতে হয়। আমরা তোকে শুধু সাজেস্ট করতে পারি, তারপর এটা তো তোর হাতে।

পূর্ণ – ঠিক, তোর কথাই ঠিক। আমাকে এবার কিছু করতেই হবে। কিন্তু আগে বল আমি কিভাবে তোকে হেল্প করবো সেটাতো আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

চঞ্চল – হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলছি সেটা। সত্যি বলতে কি, তোকে আমি গত কমাস ধরে বারবার আসতে ইনসিস্ট করছিলাম, তার একটা উদ্দেশ্য ছিল। না, না, মানে তোকে তিন বছর পর দেখবো, আড্ডা মারব – দ্যাটস গ্রেট। সেটা তো আছেই, উই লুক ফরোয়ার্ড টু ইট। কিন্তু, এবার আমি চাইছিলাম তুই আমার জন্য এটা কর, হেল্প কর একটু। আফটার অল, ইউ আর মাই ওল্ডেস্ট ফ্রেন্ড, সারা জীবনের বন্ধু ।

(চঞ্চল আবার খাওয়ায় মন দেয়, পূর্ণ তাকিয়ে থেকে খেতে শুরু করে। চঞ্চল সময় নিচ্ছে। ইমোশন কন্ট্রোল করার চেষ্টা করছে।)

ওকে, শোন তাহলে । আসলে ব্যাপারটা খুব সোজা । আমি তোকে শুধু কিছু সময় অমলার সঙ্গে কাটাতে বলছি । আমাকে বাদ দিয়ে। কটা দিন, ব্যাস। তারপর আমি ফিরে আসব, আর ততদিনে সব ঠিক হয়ে যাবে।

পূর্ণ – ব্যাস? বলছিস অমলাকে কদিন আমি দেখাশোনা করব আর তাতেই সব ঠিক হয়ে যাবে? আর ইউ সিরিয়াস?

চঞ্চল – হ্যাঁ, রাদার অমলা তোর দেখা শোনা করবে। ওকে কদিন তোর দেখাশনা করতে দে। অ্যালাও হার টু ফাস ওভার ইউ। ইট শুড ডু দ্য ট্রিক। তোর শুধু এইটুকু কাজ। তারপর তিনদিনের মাথায় আমি ফিরে আসব, এসে ওর কাছে সটান উপস্থিত হবো – লাইক নর্মাল লাভি-ডাভি কাপল। যেন কক্ষনো কিচ্ছু হয় নি। আমি ওকে জড়িয়ে ধরব, ও আমাকে জড়িয়ে ধরবে । এভ্রিথিং উইল বি ব্যাক টু নর্মাল, জাস্ট লাইক ইট ওয়াজ ফিউ মান্থস ব্যাক।

পূর্ণ – আমাকে যা বলছিস করবো, কিন্তু কি করে এই মিরাকলটা হয়ে যাবে, সেটা তো বুঝতে পারছি না কিছুতেই। তাছাড়া তোর কি মনে হয় অমলা এখন গেস্ট এন্টারটেন করার মুডে আছে? তোদের এরকম কিছু একটা সমস্যা চলছে। কথা বার্তা বন্ধ। ও নিশ্চয় আপসেট হয়ে আছে। হয়তো আরও বেশী। সত্যি বলতে কি আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না, এসবের মধ্যে তুই কেন আমাকে এখানে থাকতে বলছিস?

চঞ্চল – কেন, তুই কি বুঝতে পারছিস না? তুই আমার সবচেয়ে পুরনো বন্ধু। আমার না শুধু, আমাদের। আমার আরও অনেক বন্ধু আছে , কিন্তু তাদের দিয়ে এটা হত না । ইয়েস, এটা আমি অনেক ভেবে দেখেছি, একমাত্র তুইই এখানে হেল্প করতে পারবি ।

পূর্ণ – দ্যাখ, তোরাও তো আমার সবচেয়ে বড় বন্ধু । কিন্তু আমি বুঝতাম যদি তোরা দুজনেই থাকতিস । হয় এরকম, এমন সময়ে বাইরের কেউ থাকলে ঝগড়া ভুলে লোকে অ্যাডজাস্ট করার চেষ্টা করে আর করতে করতে সবকিছু হঠাৎ স্বাভাবিক হয়ে যায়। সেটা হলেও বুঝতাম। কিন্তু এখানে তুই নিজেই থাকবি না, বুঝতে পারছি না তোদের দুজনের খটামটিটা ঠিক হবে কি করে।

চঞ্চল – ট্রাস্ট মী, ইট মাইট ওয়ার্ক । অমলা তোকে দেখলে খুশি হবে, ওর মন ভাল হয়ে যেতে পারে ।

পূর্ণ – খুশি হবে? সত্যি বলতে কি শেষ দু একবার যখন দেখা হয়েছে, আমার কিন্তু উল্টোটাই মনে হয়েছে। ও আমাকে নিয়ে বড্ড অসন্তুষ্ট থাকে, ভেরি ইম্পেসেন্ট টু। আসলে আমার এই অগোছালো জীবন নিয়ে ও বেশ ডিসগাস্টেড ছিল লাস্ট টাইম, তোর মনে নেই? আমার তো স্পষ্ট মনে আছে ।

চঞ্চল – অত ভাবিস না পূর্ণ। আমাকে ট্রাস্ট কর, ইট মাইট ওয়ার্ক। আমার জন্য করছিস মনে করে চোখ বুঁজে করে যা।

(দুই বন্ধু খেতে খেতে বিয়ারে চুমুক দিতে থাকে। এমন সময়ে অমলা ঘরে ঢোকে, মুখে অপ্রসন্নতা, ক্লান্তি আর কিছুটা বিরক্তি।)

পূর্ণ – কিভাবে আসলে, কোন আওয়াজ পাইনি তো ।

অমলা – আচ্ছা এসে গেছো । না, আমার কাছে তো চাবি থাকে, তাই আর ডাকার দরকার হয় না। তোমার আসতে কোন অসুবিধা হয় নি তো?

পূর্ণ – না, না মোটামুটি পুরো দিল্লী ঘুরে –

(থেমে যায়, কারণ উত্তরের অপেক্ষা না করেই অমলা স্টেজের অন্য কোনায় রাখা সোফায় বসে কাগজ পড়ায় মন দিয়েছে)

(সব চুপচাপ। চঞ্চল খাবারের থালা বাটি গুছিয়ে নিয়ে উঠে যায়, এবার অমলা কাগজ রাখে)

অমলা – পূর্ণ, এদিকে এসে বসো শুনি। তোমার কি খবর বল।

পূর্ণ – (একটা চেয়ার টেনে বসে) আমার কথা আর কি শুনবে, একলা মানুষ। কোন না কোন ভাবে চলতেই থাকে । তাই বলার মত কোন খবর হয় না । তোমরা কেমন আছো, নতুন কি খবর সেটা বরং বলো ।

অমলা – আমাদের কথা থাক,আগে তোমার কথা বল তো। তোমার মাস্টারি কেমন চলছে?

পূর্ণ – অ্যাজ ইউজুয়াল । সেই পড়ান, টিচারদের পলিটিক্স, কে কত ব্যাচ পড়াচ্ছে সেই নিয়ে কপচানি, কবে নতুন পে রিভিশন আসবে সেই দিকে চেয়ে বসে থাকা ।

অমলা – আর তোমার পর্বতারোহণ পর্ব?

পূর্ণ – এখন পাহাড় ছেড়ে আহারে মন দিয়েছি । হ্যাঁ অমলা, আমি আজকাল দারুন রান্না করছি । ভাবতে পারবে না, আমি কিভাবে চল্লিশ জনের খাবার একা হাতে রান্না করেছি আমার ছাত্রদের জন্য,অ্যাজ দেয়ার সেন্ড অফ ট্রীট । শুনবে কি কি রান্না করেছিলাম – বিরিয়ানি, মাটন –

অমলা – নিজেকে ভুলিয়ে রাখার এইসব চেষ্টা ছাড়ো । এবার কিছু একটা করো, কতদিন এরকম শহর ছেড়ে দূরে পড়ে থাকবে? অন্য চাকরি দেখার চেষ্টা করো না কেন?

চঞ্চল – (বাইরে থেকে) আমি তো বললাম, ইংলিশ পড়াস, একটা অ্যাপ্লাই করে দে চায়নায়, আমি ব্যাবস্থা করে দেবো।

অমলা – তুমি কি সেই আগের বাড়িটাতেই আছো?

পূর্ণ – এখনও অবধি । প্রব্লেম হচ্ছে বাড়ির রেন্ট ক্রমাগত বেড়ে যাচ্ছে। কি করবো ভাবছি। দেখি যদি কারুর সঙ্গে শেয়ার করা যায়। চেষ্টা করছি, কিন্তু পাচ্ছি না ।

অমলা – দোষ তোমার। তুমি সবাইকে অ্যালাও কর তোমাকে এক্সপ্লয়েট করতে। সরকারী স্কুলে চাকরি করো, যেখানে যখন ট্র্যান্সফার করছে, মুখ বুজে চলে যাচ্ছো। কেন? বাড়ীওয়ালা ভাড়া বাড়াতে বলল, বাড়িয়ে দিলে। কেন? কারণ মুখ বুজে সবার লাথি খাওয়ার অভ্যাস তোমার। তারপর সেই মেয়েটা, কি যেন নাম, হ্যাঁ সুতপা। তোমাকে ভক্কি দিয়ে চলে গেল, চুপচাপ মেনে নিলে।

পূর্ণ – না, না ভক্কি দেবে কেন । আমিই তো ওকে অপেক্ষা করতে বারণ করেছিলাম। আমার জন্য কাউকেই অপেক্ষা করাতে চাই নি কোনদিন। আমি তো জানি আমি বিয়ে করার জন্য তৈরী ছিলাম না।

চঞ্চল – (ঘরে ঢোকে) আর কবে তৈরী হবি? পঞ্চাশ পেরোলে বিয়ের জন্য তৈরী হবি? (অন্য দিক দিয়ে বেরিয়ে যায়)

পূর্ণ – আরে, এখনতো শুধু বিয়াল্লিশ, পঞ্চাশ কেন বলছিস ?

অমলা – শুধু বিয়াল্লিশ ? এটাই তোমার জীবনটা ধ্বংস করে দিচ্ছে পূর্ণ। (ভেঙ্গিয়ে বলে) আমি তো শুধু জীবনটাকে উপভোগ করতে চাই, তাই পাহাড়ে চড়তে যাচ্ছি। আমি তো শুধু একা মানুষ, আমার আর কিসের টাকার দরকার। আমি তো শুধু বিয়াল্লিশ, আমি কি এখনও বড় হয়েছি? ব্যাস এই করে করে এখন মাথার ছাদ বাঁচিয়ে রাখা মুশকিল হচ্ছে।

চঞ্চল – (বাইরে থেকে চেচিয়ে) এখনও সময় আছে, এরপর লোকে তোর পাছার কাপড় টেনে নিয়ে চলে যাবে, তুই গুহ্যদ্বারে লাঠি গুঁজে দাঁড়িয়ে থাকবি।

অমলা – (চঞ্চলের উদ্দেশ্যে) ডিসগাস্টিং ব্রুট! পুর্ণ, তুমি কি কক্ষনো ভাবো না, কি তোমার পোটেন্সিয়াল, আর কি তুমি করেছো জীবনে? লজ্জা করে না, নিজের জীবনটাকে এভাবে নষ্ট করার জন্য? যারা তোমার কথা ভাবে তাদের কিরকম লাগে সেটা বোঝো? বোঝো কি তাদের এ নিয়ে কিরকম রাগ হতে পারে?

চঞ্চল – (সুটকেস নিয়ে ঢোকে, কাঁধে ব্যাগ) আচ্ছা পূর্ণ, আমি চললাম। দুদিন বাদেই ফিরব। (ঘর থেকে বেরিয়ে যায়, কিন্তু তখনও ষ্টেজে)

পূর্ণ – দাঁড়া আমি আসছি, তোর লাগেজ ট্যাক্সিতে তুলতে হেল্প করে দেবো। (বেরিয়ে যায়)

চঞ্চল – না, না একটা তো ব্যাগ, কোন দরকার নেই।

পূর্ণ – নারে চঞ্চল, হবে না। তুই যা চাচ্ছিস, সেটা কিছুতেই হবে না।

চঞ্চল – কি হবে না? কি বলছিস তুই?

পূর্ণ – দেখছিস না অমলা কিভাবে কথা বলছে? আমাকে ও সহ্য করতে পারছে না, আমার যে কোন কথায় তেলেবেগুনে জ্বলে যাচ্ছে। এতদিন পরে দেখা হয়েছে, এখনই যদি এরকম হয়, এর পরে কি হবে ভেবেই তো আমার রক্ত ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে। ও কবে থেকে এরকম খাণ্ডারনি হয়ে গেল রে চঞ্চল ? কেন হয়ে গেল?

চঞ্চল – সেই জন্যেই তো বলছি তোকে চাই।

পূর্ণ – কিন্তু আমাকে কেন ? আমাকে দিয়ে কিভাবে হবে? (ভাবে) ও – এবার বুঝতে পেরেছি, হ্যাঁ হ্যাঁ, স্পষ্ট বুঝতে পারছি শুধু কেন আমাকে দিয়েই হবে, কেন আর কেউ নয়।

চঞ্চল – গুড , নাও ইউ সি দ্য লাইট?

পূর্ণ – তাই তো মনে হচ্ছে।

চঞ্চল – তোর মনে আছে পূর্ণ, অমলা আমাকে নিয়ে কি বলতো? বলতো – তুমি অনেক উচুতে উঠবে চঞ্চল, অনেক। ও বলতো, আর আমার বুকটা ফুলে ফুলে উঠত, আমি বিশ্বাস করতাম, করতে শুরু করেছিলাম – আমি এক লম্বা রেসের ঘোড়া, যেমন অমলা বলছে সেটাই সত্যি, আমি সত্যিই ট্যালেন্টেড অ্যান্ড টু মেক হার হ্যাপী আই হ্যাভ টু প্রুভ হার রাইট। আমি এগিয়ে গেছি, উঁচুতে উঠেছি আর অমলা আমাকে বলেছে, তুমি পারবে চঞ্চল, তোমার মধ্যে আছে। বলেছে সেটা, এমন কি বছর দুয়েক আগেও বলেছে। তুই বুঝতে পারছিস, এটা কিরকম প্রেসার ক্রিয়েট করতে পারে? আমি তো ভাল আছি, জীবনে ভাল ভাবে বেঁচে থাকার জন্য যা চাই, সব কি নেই আমার? কিসের অভাব রে আমার? কিন্তু ওর এই ভাবনা যে আমি পারব, আরও উঁচুতে উঠতে পারব – ইটস কিলিং মি পূর্ণ। ইট কিলস ফ্রম ইনসাইড ।

পূর্ণ – ওর সাথে কথা বলে দেখ। বোঝার চেষ্টা কর। আমি যে অমলাকে চিনতাম, ও জীবনে সাফল্য চেয়েছে, সেটলড লাইফ হোক সবসময়ে এমনটাই চেয়েছে। কিন্তু তাই বলে নিজের চারপাশে কোন গণ্ডী তো কেটে দেয় নি।

চঞ্চল – বলেছি, চেষ্টা করিনি ভাবছিস? আসলে ও ভাবে আমি নিজেকে নষ্ট করছি, নিজের ক্ষমতাকে কাজে লাগাতে পারছি না। উঁচুতে ওঠা, স্কাই ইস দ্য লিমিট – এসব ভাবনা ঠিক আছে যখন তোমার বয়েস অল্প, যখন পুরো জীবনটা সামনে পড়ে আছে। কিন্তু আমার তো আর সেটা নয়। আমদের এখন যা বয়স, আওয়ার পারস্পেক্টিভ অফ লাইফ হ্যাজ টু চেঞ্জ, ইট হ্যাস চেঞ্জড। আমি বলি চারপাশের সবাইকে দেখো, অন্তত যাদের আমরা চিনি। আমরা কি তাদের থেকে কিছু খারাপ আছি? দেখুক আমাদের সব ক্লাস মেটদের, দেখুক তোকে? জীবনটাকে দেখার চোখটা বদলানো দরকার। আমার বদলেছে, অমলারও বদলানো দরকার।

পূর্ণ – ঠিকই তো বলেছিস রে চঞ্চল। তোরা যে সফল, সেটাতো সত্যি। আর আমি জীবনের চড়াই উৎরাই ধরে হোঁচট খেতে খেতে চলেছি।

চঞ্চল – (থামে, পুর্ণকে দেখে) দ্যাখ, ইউ আর টেকিং ইট টু হার্ট। আমাকে ভুল বুঝিস না। আমি বলছি না, তুই তোর জীবনে ব্যার্থ। না আমি কক্ষনও সেটা বলব না। স্কুলে পড়াচ্ছিস, কোন মার্ডারার বা ড্রাগ অ্যাডিক্ট তো নোস। তবে, সত্যি কথা স্বীকার করতেই হবে, সাধারণত জীবনে যেই সব সাকসেস প্যারামিটার, তাতে তুই অতটা সফল নোস। ইটস বিটুইন ওল্ড পালস, ডোন্ট টেক ইট আদার ওয়াইজ – তুই এমন কিছু করিস নি যাতে তোকে সেভাবে সফল বলা যায়। সেই জন্যেই আমি তোকে বলছি, তোর সাহায্য চাইছি।

পূর্ণ – ঠিক আছে, থাকবো। কি করতে হবে বল।

চঞ্চল – আমাদের সম্পর্কটা খুব খারাপ জায়গায় চলে গেছে রে পূর্ণ। এখনও শেষ হয়ে যায় নি, কিন্তু প্রায় শেষ হবার মুখে। দিস ইজ মাই লাস্ট ডিচ অ্যাটেম্পট। তোর সাহায্য চাই পূর্ণ। কিচ্ছু স্পেসাল করতে হবে না তোকে, জাস্ট বি ইওর সেলফ। নাথিং মোর, নাথিং লেস।

পূর্ণ – ঠিক আছে চঞ্চল, আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু অমলা কি বুঝে যাবে না, যদি সন্দেহ করে কিছু?

চঞ্চল – কেন, কেন সন্দেহ করবে? ও জানে আমি দরকারি কাজে বম্বে যাচ্ছি। আর তুই এসেছিস, ও বাড়িতে অতিথির দেখাশনা করছে। ও সেটা করতে ভালবাসে। আর এখানে অন্য কোন অতিথি তো নয়, তুই, যে কিনা ওরও বন্ধু। সো ইন মাই মাইন্ড, দিস ইজ আ ভেরি ক্লিন অ্যাপ্রোচ – ওই যে ট্যাক্সি এসে গেছে, ট্যাক্সি – (ট্যাক্সির দিকে এগিয়ে যেতে থাকে) বাই পূর্ণ, তোর ভরসায় যাচ্ছি । আমি জানি তুই করবি, তুই করতে পারবি।

(এতক্ষণ পিছনে অমলা ঘরটাকে গুছাচ্ছিল । ঘরটা বেশ ভাল সাজিয়েছে এখন। অমলার মুখ এখন অনেক শান্ত, স্মিত। পূর্ণ ঘরে ঢোকে)

অমলা – পূর্ণ, আই অ্যাম রিয়ালি সরি।

পূর্ণ – কেন, কি হয়েছে?

অমলা – না, আমি যেভাবে তোমার সাথে কথা বলেছি, সেটা ঠিক নয়। আমার কোন অধিকার নেই ওরকম ভাবে কথা বলার। তুমি চা খাবে তো? আমি চা বসিয়ে দিয়েছিলাম তোমার জন্যে। (অমলা বাইরে যায় আর ট্রেতে করে চা সাজিয়ে ঘরে ঢোকে) আসলে বলো কতগুলো বছর হয়ে গেছে, মনে আছে সেসব দিনগুলো আমরা সবাই যখন একসঙ্গে কলেজে ছিলাম? এমন নয় যে আমি আর সবার সঙ্গে এভাবে কথা বলতে পারি এখন আর। কিন্তু তোমার সঙ্গে পূর্ণ, আমি যেন পারি। এখনও সে লিবার্টি নিতে পারি। পারি না? তুমি কিছু মনে করো না পূর্ণ। সত্যি কিছু মনে কর নি তো?

পূর্ণ – না, না আমি কিচ্ছু মনে করিনি। বন্ধু হিসাবে বলেছ, এরকম বলা যায়। তাতে কিচ্ছু হয় না। অন্তত আমাকে তুমি আরামসে বলতে পারো ।

অমলা – না, না, তুমি যাই বল। আমার অতটা উচিৎ হয় নি । চিনি দু চামচ তো? বিস্কুট দেবো তোমায়?

পূর্ণ – আসলে, অমলা, আমি এখনও সেই রকমই আছি। বয়সের হাওয়া আমার গায়ে হয়তো সেভাবে লাগে নি। তোমরা মনে করিয়ে দিলে বলে বয়সটা মনে পড়ল। তাছাড়া নিজেকে সমীহ দেওয়া বা গাম্ভীর্যের সঙ্গে দেখার মত কিছু করিও তো নি এই জীবনে।

অমলা – দেখেছো, ঠিক ধরেছি তুমি আসলে ভীষণ রেগে গেছো। তোমার অভিমানের কথা এটা। আমি বুঝতে পারি নি গো। তুমিও বদলে গেছো , আমার কথা গুলো তোমার মনে কিভাবে লেগেছে! ছি, ছি , কেন যে বললাম!

পূর্ণ – আমি জানি না কিভাবে বোঝাব তোমায় অমলা। ইটস ফাইন, আই অ্যাম অ্যাবসলিউটলি ফাইন।

অমলা – তুমি এমনিতেই কি সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছো, সেখানে আমার কথাগুলো তোমাকে কিভাবে আঘাত করেছে। এরকম সময়ে একটা ছোট কথাও বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে, সব কিছু ভেঙ্গে যেতে পারে –

পূর্ণ – তুমি ভাবছ আমি ভেঙ্গে চুড়ে শেষ হয়ে যাচ্ছি, নিঃশ্বেষ হয়ে যাচ্ছি? কেন এরকম মনে হচ্ছে বলো তো?

অমলা – কেন শেষ হবে তুমি? কক্ষনো এভাবে বলবে না। কিন্তু তোমাকে যখনই দেখি আমি ভাবি, তুমি সেই পূর্ণ ? না , তুমি সেই পুর্ণের ছায়ামাত্র, ছায়া। কি তোমার করার ছিল, আর কি করছো। (কিছুক্ষণ চুপচাপ, দুজনে চা খায়)

অমলা – পূর্ণ – আই অ্যাম সো সরি, আমাকে একবার অফিসে ফেরত যেতে হবে। আমার দুটো খুব দরকারী মিটিং আছে, আই জাস্ট ক্যাননট মিস। আমি অফিস থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম কারন তুমি আসছো আর চঞ্চল বেরিয়ে যাচ্ছে । কিন্তু এবার আমাকে ফিরে যেতেই হবে, প্লিজ কিছু মনে কর না ।

পূর্ণ – কোন অসুবিধা নেই, আমি খুব ভাল থাকবো। তাছাড়া আমি তো আর আজকেই চলে যাচ্ছি না। আমি ভাবছিলাম, বসে না থেকে আমি বরং তোমার ডিনারটা রেডি করে রেখে দেবো। না, না আমি বেশ ভাল রান্না করি, এই তো সেদিন চল্লিশ জনের জন্য বিরিয়ানি রান্না করলাম । আমি দেখে নেবো কি আছে বাড়িতে, তারপর –

অমলা – (রেগে যায়) কেন , তুমি কি ভাবো আমি কিছু পারি না? তাই বলেছে চঞ্চল তোমাকে? হবেই, ঐ তো বন্ধু তোমার। আমি তো তোমার কেউ নই। কেন আগে যতবার এসেছ, কম যত্ন করেছি তোমার? কেন ভাবছ এবার করব না? চঞ্চল আমার বিষয়ে এই সবই বলেছে বুঝি?

পূর্ণ – খামোকা ভুল বুঝছ অমলা। আমি তোমাকে হেল্প করতে চেয়েছিলাম শুধু।

অমলা – না, তুমি রেস্ট নাও। আমি জানি তুমি হেল্প করতে চাও। কিন্তু তুমি আমার বাড়িতে এসেছো । আই উইল ডু দ্যাট । তুমি কিচ্ছু করবে না। প্রমিস মি। আমি সন্ধ্যার মধ্যে এসে যাবো। আর শোন, তুমি যেভাবে নিজেকে কম্ফর্টেবল ফিল করবে, সেভাবে থাকবে। এই ঘরেই বসে থাকতে হবে তা তো নয় । বসার ঘরে টি ভি দেখতে পারো, পাশেই রান্নাঘর – নিজের জন্য চা কফি বানাতে পারো। তবে খবরদার রান্না করতে যাবে না।

(ব্যাগ নিয়ে অমলা বেরিয়ে যায়, পূর্ণ একা বসে ভাবতে থাকে, লাইট ধীরে ধীরে কমে আসে)

(চলবে)

বিশ্বদীপ চক্রবর্তী – পেশায় ইঞ্জিনীয়ার, নেশায় লেখক। প্রধানত গল্পকার, ইদানীং নাটকও লিখছেন। গল্প প্রকাশিত হয়েছে দেশ, বর্তমান, সানন্দা, কথা সোপান, দুকুল এবং আরও পত্রপত্রিকায়, এবার বাতায়নে। মঞ্চসফল নাটক ‘রণাঙ্গন’ – এই বছরে বেশ কয়েকবার মঞ্চে এসেছে। ধারাবাহিক উপন্যাস ‘হাগা সাহেবের ট্রেন’ প্রকাশ পাচ্ছে ‘অন্যদেশ’ ওয়েবজিনে। থাকেন অ্যান আরবার, মিশিগানে।

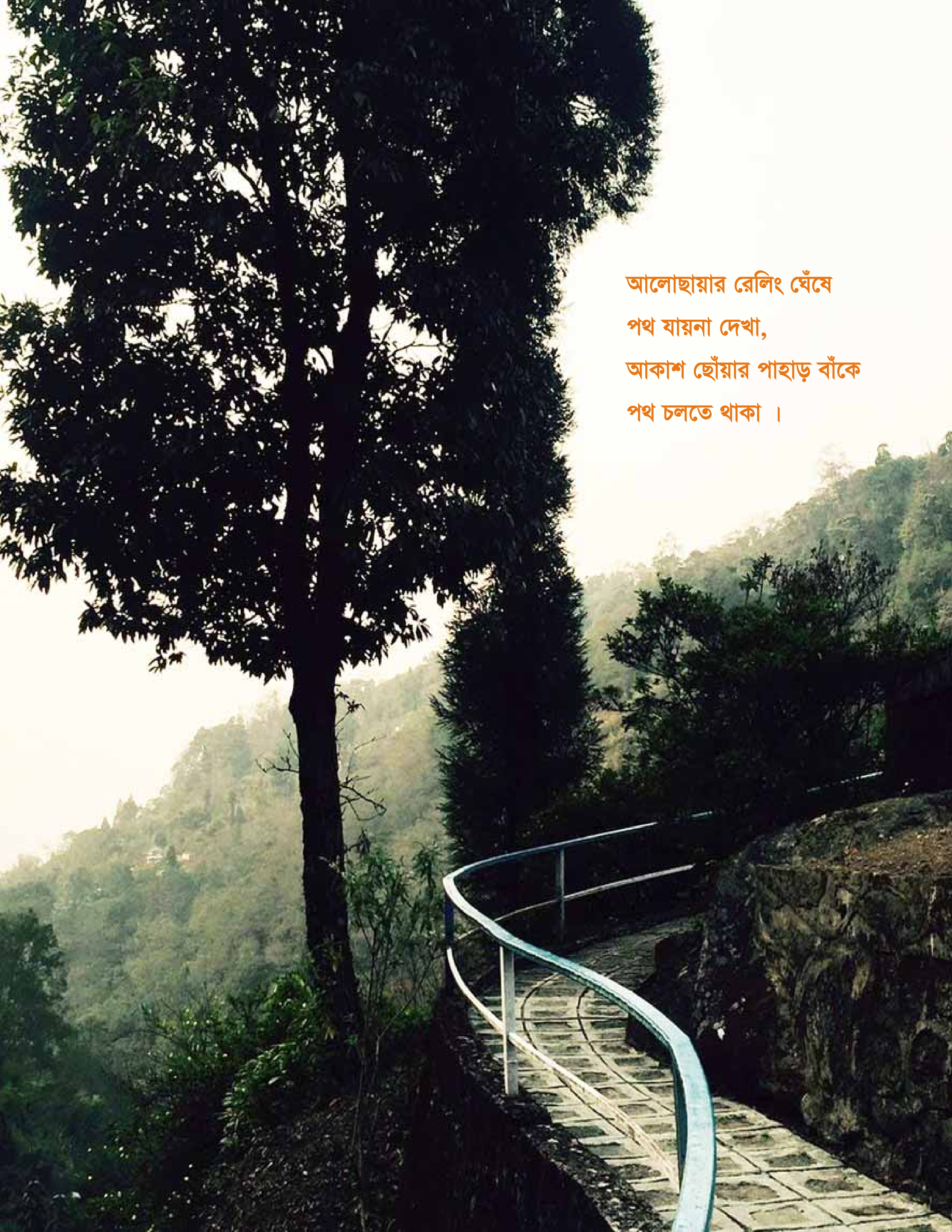

আলোছায়ার রেলিং ঘেঁষে
পথ যায়না দেখা,
আকাশ ছোঁয়ার পাহাড় বাঁকে
পথ চলতে থাকা ।